নভেম্বর ২০১৭ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ-১৪২৪

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

‘পাখি’

টিয়া পাখিটার সব রং ঝরে গেলে কী বিপদটাই না হবে!
এই বিপদের জন্য দায়ী সাহী আদভী ইসলাম। ও পড়ে ৮ম শ্রেণিতে, কানাডার ভারনন বারফোর্ড স্কুলে

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়
লেখা পাঠাও গ্রাহক হও

নবারুণ-এর চাঁদা বার্ষিক ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
  বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ডাকযোগে পাঠানো হয়।

- নবারুণ পত্রিকার সাথে যুক্ত হতে ফেইসবুকে লগ ইন করো Nobarun Potrika নামে।
  বন্ধু হও নবারুণ-এর।
  আর হ্যাঁ, ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে SutonnyMJ ফন্টে পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়:
  editornobarun@dfp.gov.bd

এজেন্টদের কপি ভি,পি, যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।
এজেন্টদের কমিশন শতকরা ৩৩% হারে দেওয়া হয়।
এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ :dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নভেম্বর ২০১৭ ■ কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪২৪

সৌজন্য সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশনা
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ফিরোজ চন্দ্র বর্ম্মন

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সানিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ :
সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : বিন্দু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

ছবি এঁকেছে, টইটই বিলাসী, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

শীত শীত আমেজ শুরু হয়ে গেছে। অতিথি পাখিরা উড়ে আসছে আমাদের দেশে। পাখিবন্ধুদের দেখে নবারুণ-এরও খুব ইচ্ছে হলো পাখি হতে। আর তাই, এবার পাখিদের নিয়ে বাক্ বাকুম করেছেন তোমাদের মতো খুদে বন্ধুরা, সাথে ছিলেন বড়োরাও।
সংখ্যাটি কেমন লাগল, জানাবে কিন্তু!

এ সংখ্যায় যা থাকছে

নিবন্ধ

০৪ বাংলাদেশের পাখি/ড. আ ন ম আমিনুর রহমান
০৯ বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় পাখি/শরীফ খান
১৫ রংতুলিতে পাখি!/জাহিদ মুস্তাফা
২৪ পাখি পর্যবেক্ষণ ও ছবি তোলার নিয়ম
মো. মারুফ রানা
২৬ আমার সেই সব পাখি/কেকা অধিকারী
২৭ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখি সংরক্ষণ
ক্যাপ্টেন কাওসার মোস্তফা
২৯ পাখি বান্ধব আইন: পাখি বান্ধব বাংলাদেশ
সাদ মাহমুদ
৪১ শীতের পরিযায়ী পাখি/এস. এম. ইকবাল
৪৪ পাখিদের ঘরে ফেরা/মোকারম হোসেন
৪৭ পাখির অভয়ারণ্য/মোল্যা রেজাউল করিম
৫৪ অ্যাংরি বার্ডস! সত্যিই কি রাগি পাখিরা?
রেজা নওফল হায়দার
৫৬ ঢাকায় নবান্ন আর পৌষমেলা
রফিকুল ইসলাম রফিক

কমিকস

৩৩ সব্যসাচী চাকমা

গল্প

৩৪ চিৎকার! / চান্দ্রেয়ী পাল মম
৩৫ চার চিলের নতুন বাড়ি / আহমেদ রিয়াজ
৪০ একটি রাজহাঁস / মাহমুদা সুলতানা
৪৯ ডাহুক বোনের গল্প/উৎপলকান্তি বড়ুয়া
৫০ সাইমন ও তার পাখিটি/ফজলে আহমেদ
৫২ চাঁদের দেশের চাঁদকুমারী/বেনীমাধব সরকার

ছড়া-কবিতা

০৩ সুজন বড়ুয়া
১৩ ইসরাত জাহান
২১ আখতার হুসেন
৩৭ অপু চৌধুরী / মিশকাত উজ্জ্বল / মিলি হক
৩৮ আকরাম সাবিত / মো. মনিরুজ্জামান মনির
ওয়াহিদ জামান / ইউনুস আহমেদ
৩৯ মো. আহনাফ সিদ্দিক / সাদ সাইফ
মো. রাশেদুল ইসলাম (সাগর) / আরাফ হোসেন
৪৮ মো. মুশফিকুর রহমান মিদুল
৫৫ সরদার আবুল হাসান/ইশরা হোসেন/মনিরুল ইসলাম
৫৭ জাকির হাসান

ছোটোদের লেখা

২২ আমার প্রথম পাখি দেখা/নুজহাত জাইমা রহমান
৩৩ হাঁস ছানা/মো. রায়ান কামাল

আঁকা ছবি

০১ টইটই হিলালী
১৪ পারিজাত রানী শ্রেয়সী
১৮ তানজিনা তাজরীন / দীপাঞ্জলি বড়ুয়া
১৯ আয়ান হক ভূঁঞা / প্রিয়তি সালেহ উদ্দিন
২০ নাজিবা সায়েম / সুহেইর আরাফী (তিতির)
২১ আনিশক শীল
২৬ মো. সিনদিদ হোসেন
৫৫ কাজী নাফিসা তাবাসসুম

প্রতিবেদন

৫৮ ঐ দেখা যায় পদ্মা সেতু! / শাহানা আফরোজ
৫৯ সাইবার অপরাধ: এসো সচেতন হই / মেজবাউল হক
৬০ বাংলাদেশি চিকিৎসকের অভাবনীয় সাফল্য
মো. জামাল উদ্দিন
৬১ প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে অঙ্গ সংযোজন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬২ 'ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস পিস প্রাইজ'
পাচ্ছে সাজেদা আক্তার / জান্নাতে রোজী
৬৩ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮: প্রসেনজিৎ কুমার দে
৬৫ শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ / সুলতানা বেগম
৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ / সাদিয়া ইফফাত আঁখি

মতামত...

Sk Ujjwal

কখন গল্প কবিতা নেওয়া হয়? কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

Nobarun Potrika: নবারুণ এখন খুব নিয়মিত। আর তাই, সব বয়সি লেখকদের কাছে অনুরোধ, যে-কোনো বিশেষ দিবস বা মাস উপলক্ষে লেখা পাঠাতে চাইলে অনুগ্রহ করে সেই দিবস বা মাসের কমপক্ষে দুমাস আগে লেখা পাঠালে সুবিধা হয়। পত্রিকাটি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়। লেখা ও ছবি অধিদপ্তরের ডাক ও ই-মেইল ঠিকানায় (editornobarun@dfp.gov.bd) পাঠানো যেতে পারে।

রহিমা আক্তার মৌ

নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে স্কুল প্রতিনিধি হলে এরপর কি করতে হবে। জানলে মেয়ের নাম-ঠিকানা পাঠাতাম।

Nobarun Potrika : স্কুল প্রতিনিধিদের নিজের স্কুলের নানান খবর নবারুণে পাঠানোর সুযোগ থাকছে। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্কুলে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাই, যাতে ওর লিডারশিপ কোয়ালিটি, আয়োজনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বন্ধুদের লেখক/ আঁকিয়ে হয়ে উঠতে ভূমিকা রাখতে পারবে ও। নবারুণ ওকে সেই প্লাটফমটা দিতে প্রস্তুত। স্কুল প্রতিনিধি নবারুণের বিক্রয় এজেন্ট-ও হতে পারবে। নবারুণ যদি ওর হাত খরচের উপায় হয়, মন্দ কি? শিশুরা আর্থিক ম্যানেজমেন্টে দক্ষ হতে শিখুক না।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে এবং facebook.com/nobarunpotrikabd সাইটে পত্রিকাটি পড়া যাবে, মতামতও দেওয়া যাবে।

পাখিদের প্রিয় দেশ

সুজন বড়ুয়া

যেখানে আকাশ অনন্ত নিঃসীম
ফসলের মাঠ দূর—দিগন্ত জোড়া,
যেখানে নিবিড় হিজল তমাল নিম
তরু-পল্লবে হাজারো স্বপ্ন মোড়া।

বনে মর্মর বাতাসের সঙ্গীত
নদী দুর্বার সাগরের ঠিকানায়,
আনে কত সুর গ্রীষ্ম বর্ষা শীত
প্রকৃতি কেবল রং রূপ বদলায়।

পাহাড় যেখানে পরিপাটি ছিমছাম
ঝর্ণার সাথে বর্ণালি খেলা পাতে,
সাজানো শান্ত ছায়ামাখা মায়া গ্রাম
জীবন রঙিন ঢেউ তোলে দিনে রাতে।

চলে হাসাহাসি খুনসুটি মাতামাতি
মানুষ সুখের আলপনা যায় এঁকে,
সুখে পাশে থাকে বিপদেও চিরসাথি
সোনালি বর্ণে প্রাণের পদ্য লেখে।

যেখানে স্নিগ্ধ সব কিছু মোহনীয়
পাখিরা এমন দেশকেই ভালোবাসে,
এমন দেশই পাখিদের বড়ো প্রিয়
এমন দেশেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে।

পাখিরা সে দেশে আসে সুখে বাঁধে ঘর
গান খেলা ওড়া কখনো হয় না শেষ,
পাখিরা সে দেশে নিরাপদ মনোহর
বাংলাদেশ কি নয় সেই প্রিয় দেশ!

ছবি: ড. আ. ম. আমিনুর রহমান

দেখতেক বড়ো সারস বা বক পাখি ● ছবি : ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

বাংলাদেশের পাখি

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

প্রজাপতি ছাড়া আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীতে আর কোনো উড়ন্ত রঙিন সৌন্দর্য আছে কি?

অবশ্যই আছে!

সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ছাড়াও নানা রঙে রাঙিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এক শ্রেণির উড়ন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী— রঙিন ডানায় ভর করে যারা ওড়ে বেড়ায় আকাশময়, গাছের ডালে বসে চমৎকার সুরে গান গায়, আমাদের মনে দেয় আনন্দ, রক্ষা করে পরিবেশের ভারসাম্য— ওরা আর কেউ নয়, ওরা হলো পাখি, আল্লাহর অন্যতম সুন্দর সৃষ্টি।

উড়ন্ত-দুরন্ত বর্ণিল পাখিগুলোর মতো এমন সুন্দর প্রাণী পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। নানা আকারের, নানা রঙের ও নানা ঢঙের পাখিগুলো যখন ওদের স্বপ্নের ডানায় ভর করে নীল আকাশে ওড়ে বেড়ায় তখন দেখতে কতই না ভালো লাগে?

ছোট্ট বন্ধুরা, উড়ন্ত রঙিন সৌন্দর্যগুলোকে নীল আকাশে ওড়ে বেড়াতে দেখলে তোমাদের মনের কোণে নিশ্চয়ই পাখির মতো আকাশে ডানা মেলে ওড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে? ছেলেবেলায় আমার মনেও কিন্তু এমন ইচ্ছে জাগত। অবশ্য ডানা না থাকায় উড়তে পারিনি বলে আমি কিন্তু মোটেও বসে ছিলাম না। পাখির পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে আমাদের এই সুন্দর দেশটির বনবাদাড়, মাঠঘাট, গ্রামগঞ্জ ও নদী-হাওর-সমুদ্রে কতই না ঘুরে বেড়িয়েছি?

দেখেছি কতই না সুন্দর সুন্দর পাখি! তুলেছি তাদের সুন্দর সুন্দর কত-না ছবি!!

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি জানো পুরো পৃথিবী জুড়ে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির বা ধরনের পাখির বাস? আর অনুমান করা হয়, বিভিন্ন প্রজাতির পাখিগুলোর মোট সংখ্যা ২০-৪০ হাজার কোটি। বাংলাদেশে কত

আধুনিক কালের পাখিগুলো এসব ডায়নোসর যুগের পাখি (থেরোপড) থেকে যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হয়েছে।

প্রজাতির পাখির বাস তা গবেষণার অভাবে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও ধারণা করা হয়, ভারতীয় উপমহাদেশে যে প্রায় ১২শ প্রজাতির পাখির বাস তার কম-বেশি।

৭০০ প্রজাতির পাখি এ দেশে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, বিগত কয়েক শতকে দু'শতাধিক প্রজাতির পাখি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় ১২শ প্রজাতির পাখি নানা কারণে হুমকির মুখোমুখি অবস্থান করছে। অদূর বা দূর ভবিষ্যতের যে-কোনো সময় এরা পৃথিবীকে গুডবাই জানাবে। হারিয়ে যাবে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী থেকে।

পাখি হলো বিভিন্ন আকার, ওজন ও আকৃতির উষ্ণ-রক্তবিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী যাদের দেহ পালকে আচ্ছাদিত, চোয়ালের উপর রয়েছে দাঁতবিহীন শক্ত ঠোঁট বা চঞ্চু (Beak), হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, যাদের মেয়েরা শক্ত খোসাযুক্ত ডিম পাড়ে, দেহের বিপাকীয় হার উচ্চ, হাড় ফাঁপা ও কঙ্কাল হালকা এবং যারা সাধারণত ওড়তে পারে।

জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) রেকর্ড থেকে জানা যায় পাখিরা থেরোপড (Theropod) দলের পালকযুক্ত পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যারা প্রথাগতভাবে সরিসিয়ান ডায়নোসরদের (Saurischian dinosaurs) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বর্তমানে নানা গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, চীনে প্রাপ্ত ক্রিটাসিয়াস যুগের প্রায় ১২৫ মিলিয়ন বছর আগের *কনফুসিয়াসওরনিস স্যাঙ্কটাস* (*Confuciusornis sanctus*) হলো সত্যিকারের চঞ্চুযুক্ত পাখির সবচেয়ে পুরনো জীবাশ্ম।

আধুনিক কালের পাখিগুলো এসব ডায়নোসর যুগের পাখি (থেরোপড) থেকে যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস উইলাগবি ও জন রে সর্বপ্রথম ১৬৭৬ সালে পাখিদের শ্রেণিবদ্ধ করেন যা ১৭৫৮ সালে বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস পরিবর্তন করে টেক্সোনমিক শ্রেণি বিন্যাসে নিয়ে আসেন যেটা এখনও প্রচলিত। তবে ১৯৯০ সালে সিবলি ও আহলকুইস্ট পাখির যে শ্রেণি বিন্যাসটি উদ্ভাবন করেছেন সেটাই সবচেয়ে আধুনিক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে বিবেচিত।

পাখিরও শ্রেণি আছে!

পাখির শ্রেণি (Class) অ্যাভিসকে (Aves) দুটি মহাবর্গে (Superorder) ভাগ ভাগ করা হয়েছে, যেমন– ১) উড়ন অক্ষম পাখি বা প্যালিওগনেথি (Paleognathae) এবং ২) উড়নক্ষম পাখি বা নিওগনেথি (Neognathae)।

উড়ন অক্ষম পাখি'র মহাবর্গে পাঁচটি বর্গ (Order) ও ছয়টি পরিবারে (Family) মোট ৫৬টি পাখি অর্ন্তভুক্ত। যেমন– উটপাখি, কেশোয়ারি, ইমু ইত্যাদি।

তেইশটি বর্গ ও ১৬৬টি পরিবারের বাকি মোট ৯,৭৮৯টি পাখি উড়নক্ষম পাখি'র মহাবর্গের অর্ন্তভুক্ত।

দু'টি মহাবর্গ ও ২৮টি বর্গের অন্তর্গত এই পাখিগুলোকে পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিবার, উপ-পরিবার (Sub-family), গণ (Genus) ও প্রজাতিতে (Species) ভাগ করা হয়েছে।

একটি কথা মনে রেখো, এই ২৮টি বর্গে যে ৯,৮৪৫টি প্রজাতির পাখি রয়েছে তার প্রায় অর্ধেকই হলো একটি বর্গ প্যাসারিফরমেস-এর (Passeriformes) অর্ন্তগত। এ বর্গে মোট ৮২টি পরিবার রয়েছে। এদের সামনের পায়ে তিনটি আঙুল ও পেছনের পায়ে একটি আঙুল রয়েছে, তাই এরা **পার্চিং** ক্ষমতাসম্পন্ন পাখি (Perching

Bird) নামে পরিচিত। আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েলও (Magpie Robin) কিন্তু এই বর্গেরই পাখি।

পাখিদের কেন চাই?

পৃথিবীর সব বন্যপ্রাণীর মধ্যে পাখিকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ এরা ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে, ফুলের পরাগায়ণের মাধ্যমে, বীজ স্থানান্তর করে, ময়লা-আবর্জনা ও পচা-গলা খেয়ে, এমনকি প্রতিবেশ সূচক হিসেবে খাদ্য-শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে আমাদের উপকার করে থাকে।

পাখির বসবাস

পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের আবাসযোগ্য এলাকায় পাখি বাস করতে পারে। বেশিরভাগ পাখিই বৃক্ষবাসী ও আকাশচারী, অবশ্য কোনো কোনো পাখি মাটির উপর বা গর্তে বাস করে।

পাখিরা সাধারণত জোড় বাঁধে, বাসা বানায় ও তাতে ডিম পাড়ে। কোনো কোনো পাখি গাছের মগডালে বাসা বানায়, কেউ বানায় পুরনো বিল্ডিংয়ে, কেউ পাহাড়ের চূড়ায়, কেউবা গাছের কোটরে-খোড়লে, কেউবা ঝোঁপঝাড়ে কিংবা মাটির উপর। অবশ্য কিছু পাখি, যেমন– কোকিল, পাপিয়া, বউ কথা কও, চোখ গেল নিজেরা বাসা বানায় না এবং ডিমেও তা দেয় না। তারা অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে ও নিজেদের বংশবৃদ্ধির কাজটি সুচতুরভাবে অন্য পাখির মাধ্যমে করিয়ে নেয়। আবার কিছু পাখি নিজেদের ডিম ফোটানো কাজটা প্রাকৃতিক ইনকুবেটর বানিয়ে তার মাধ্যমে সম্পন্ন করে, যেমন– ম্যালি মুরগি, ম্যালেও ইত্যাদি পাখি। এরা প্রকৌশলী পাখি নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের পাখিগুলোর মধ্যে কম-বেশি ৪০০ প্রজাতি স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস করে, অর্থাৎ এরা সারাবছর এদেশে থাকে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা তোলে ও বংশবিস্তার করে। এরা এদেশের আবাসিক পাখি (Resident Bird) নামে পরিচিত।

এছাড়াও প্রায় ৩০০ প্রজাতির পাখি পরিযায়ী (Migratory) অর্থাৎ বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় এরা এদেশে আসে, বসবাস করে ও সময়মতো মূল আবাসস্থলে ফিরে যায়। এরা সাধারণ মানুষের কাছে আগে এমনকি এখনও 'অতিথি পাখি' নামেই পরিচিত। এদেরই এক বিশাল অংশ এদেশে আসে

এখানে দোয়েলের শ্রেণিবিন্যাসটি এখানে উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যাতে পাখির শ্রেণিবিন্যাস বুঝতে তোমাদের কিছুটা সুবিধে হয়।

রাজ্য	: অ্যানিম্যালিয়া [সকল প্রাণী]
পর্ব	: কর্ডাটা [সকল মেরুদণ্ডী ও অন্যান্য কিছু আদিম প্রকৃতির প্রাণী]
শ্রেণি	: অ্যাভিস [সকল পাখি]
বর্গ	: প্যাসারিফরমেস [সকল পার্চিং ক্ষমতাসম্পন্ন পাখি]
গোত্র	: মাসসিক্যাপিডি [সকল দোয়েল-শ্যামা-চুটকি জাতীয় পাখি]
গণ নাম	: কপসিকাস
প্রজাতি নাম	: সলারিস

শীতকালে যারা শীতের পাখি বা শীতের পরিযায়ী পাখি নামেও পরিচিত।

আবাসিক, পরিযায়ী, অনিয়মিত ও পান্থপরিযায়ী পাখি মিলে এদেশে যে প্রায় ৭০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে সেগুলো মোট ২৫টি বর্গ ও ৬৫টি পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। বাংলাদেশের পাখিগুলোর মধ্যে আকার, ওজন ও রঙে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি ভিন্নতা রয়েছে এদের জীবনযাপন, আবাস, খাদ্যাভাস ও আচার-আচরণে। আমাদের পাখিগুলোর মধ্যে যেমন আছে জলা বা সৈকতের পাখি, তেমনি আছে লোকালয় ও বনজঙ্গলের পাখি, মাঠের পাখি, ঘাসবন-নলবনের পাখি, ঝোঁপঝাড়ের পাখি ইত্যাদি। কিছু কিছু পাখি শুধু

মানুষের আবাস এলাকা বা আশপাশে থাকে, যেমন– চড়ুই, টুনটুনি, ভাতশালিক, গো-শালিক ইত্যাদি।

কোনো কোনো পাখিদের শুধু খাল-বিল-নদী-নালা ও বিভিন্ন ধরনের জলাশয়েই দেখা যায়, যেমন– বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, বক, সারস, কাস্তেচড়া, ডুবুরি, বাটান, ইত্যাদি। কিছু পাখি আছে যারা শুধুমাত্র সুন্দরবন ও উপকূলীয় লোনাপানির বনেই বাস করে, অন্য কোথাও না। যেমন– সুন্দরি বা গেইলো হাঁস, সুন্দরি সুমচা, লাল মাছরাঙা, সিন্ধু ঈগল ইত্যাদি।

কিছু কিছু পাখিকে বন-জঙ্গল, লোকালয়, সুন্দরবন সব পরিবেশেই দেখা যায়, যেমন– বিভিন্ন প্রজাতির বুনো কবুতর, তিলা ঘুঘু, দোয়েল, বুলবুলি, নীলটুনি, ফুলঝুরি, ইত্যাদি। মাঠের বা ক্ষেতখামারের পাখিদের মধ্যে রয়েছে হট্টিটি, খরমা, নীলকণ্ঠ, কসাই, ফিঙে, ভরত, ধানি তুলিকা, শিলা ফিন্দা ইত্যাদি। ঘাসবনের পাখিদের মধ্যে রয়েছে নাগরবাটই, ঘাসপাখি, মুনিয়া, ধানটুনি, কালোবুক বাবুই ইত্যাদি।

একটি কথা মনে রেখ, সব প্রজাতির পাখি যেমন একই জায়গায় বা একই মৌসুমে দেখা যায় না, তেমনি সমান সংখ্যায়ও দেখা মেলে না।

পাখি সুন্দর

পাখি সমাজে সাধারণত ছেলে পাখিগুলোই দেখতে সুন্দর ও আকারে বড়ো হয়। এদের পালক হয় রঙিন, উজ্জ্বল ও চকচকে। ময়ূরের বড়ো পেখম পালক; মোরগের লেজের লম্বা পালক, পায়ের পেছনের যুদ্ধাস্ত্র, মাথার ফুলকা ও গলার বড়ো লতিকা, দুধরাজ পাখির লম্বা সূচালো লেজ পালক ইত্যাদি। অন্যদিকে মেয়ে পাখির পালকের রঙে চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা অনেক কম থাকে এবং আকারে ছোটো হয়ে থাকে। তবে, ব্যতিক্রমও আছে, যেমন– স্ত্রী নাগরবাটই ও রঙিলা চ্যাগার মেয়েগুলো ছেলেগুলোর তুলনায় বড়ো ও সুন্দর হয়। আবার অনেক প্রজাতির পাখিরই ছেলে ও মেয়ে পাখি দেখতে একই রকম হয়।

তবে পাখির রাজ্যে কোনটি সবচেয়ে সুন্দর তা বলা কঠিন। একেকটি পাখি একেক দিকে সুন্দর।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো পাখি রামশালিক বা লোহারজঙ্গ মাছ খাচ্ছে

বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোটো পাখি ছোটো ফুলঝুরি কী যেন কী ভাবছে!

সৌন্দর্য বিবেচনায় এদেশের পাখিগুলোর মধ্যে ছেলে নীলটুনি বা দুর্গাটুনটুনিই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। যদিও লম্বালেজের ছেলে ময়ূর ও দুধরাজ অত্যন্ত সুন্দর। কারণ, তাদের সৌন্দর্য সবখানেই ছড়িয়ে আছে– গায়ের রঙে, ওড়ার ঢঙে, গান গাওয়ায়, বাসা তৈরিতে, খাদ্য সংগ্রহে, এমনকি জীবনযাত্রায়ও।

পাখি মা– পাখি বাবা

ডিমে তা দেওয়া ও বাচ্চা লালন-পালনের কাজ মূলত মা পাখি একা বা মা পাখি ও বাবা পাখি একত্রে মিলেমিশে করে থাকে। কিন্তু নাগরবাটই, রঙিলা কোয়েল ও কিছু কিছু পাখির ক্ষেত্রে ডিম পাড়ার পর মা পাখির আর কোনো দায়িত্বই থাকে না। বাবা পাখিই একাই এসব দায়িত্ব পালন করে।

ছোটো-বড়ো মিলমিশ

ছোট্ট বন্ধুরা বলোতো সবচেয়ে বড়ো ও ছোটো পাখির নাম কি? কি, পারলে না তো? আচ্ছা বলে দিচ্ছি, মনে রাখবে কিন্তু?

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো পাখি হলো রামশালিক বা লোহারজঙ্গ (Black-necked Stork; দৈর্ঘ্য

ছবি: ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পাখি কেন ঝগড়া করছে? পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো পাখিটা কী মৌমাছির বন্ধু?

ছবি: ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

১২৮-১৫০ সেন্টিমিটার বা সেমি ও ওজন ৪.১ কিলোগ্রাম বা কেজি), আর সবচেয়ে ছোটো পাখি হলো ছোটো ফুলঝুরি (Pale-billed Flower-pecker; দৈর্ঘ্য ৮ সেমি ও ওজন মাত্র ৬.৩ গ্রাম)।

অবশ্য বিশ্বের বৃহত্তম পাখি হলো উটপাখি (Ostrich; দৈর্ঘ্য ২৭৫ সেমি ও ওজন ১০০-১১৫ কেজি) ও ক্ষুদ্রতম হলো মৌগুঞ্জন পাখি (Bee Hummingbird; দৈর্ঘ্য ৫-৬ সেমি ও ওজন ১.৯৫-২.৬ গ্রাম)।

পাখির রকম-সকম

পাখিভেদে এদের বিচরণ, শিকার করা, খাবার খাওয়া ও বিশ্রামের সময়ের মধ্যেও বেশ তারতম্য দেখা যায়।

বেশিরভাগ পাখি সচরাচর দিনের বেলা খাবারের সন্ধান করে, মাঠে-ঘাটে-জলায় চড়ে বেড়ায় খাবারের সন্ধানে। যেমন— সারস, বক, গাঙচিল, বাটান, চা পাখি, কোকিল, কবুতর, দোয়েল, সাতভাই, মুনিয়া এবং আরও অনেক পাখি।

কিছু পাখি ভোরবেলা ও সন্ধ্যায় খাবার খোঁজে এবং দিনের বেলা বিশ্রাম করে, যেমন— বনমোরগ, মথুরা, হাঁস-রাজহাঁস, ডাহুক, কোড়া ইত্যাদি। ঈগল-চিল-শাহিন-শকুন দিনের আলোয় শিকার করে। নিশিবক, রাতচরা ও বিভিন্ন প্রজাতির পেঁচা রাতের শিকারি। কোনো কোনো পাখি আছে যারা দিনের বেলা মাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে বসে থাকে, বোঝাই যায় না যে, কোনো পাখি বসে আছে। অবশ্য এরা দিনের আলোয় ঠিকমতো চোখেও দেখে না, রাতে বেশ তৎপর এরা। এরা হলো দিনেকানা বা রাতচরা।

কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় বহু প্রজাতির পাখির মূল খাবার হলেও মাছখেকো পাখির সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। পাহাড়-বন-জঙ্গলের পাখিরা কীটপতঙ্গ, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, ফুলের রস ও ফল খায়। মাঠের পাখিরা শস্যদানা, ঘাসবীচি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদিই বেশি খায়। লোকালয়ের পাখিরা ফল, ফুলের রস ও কীটপতঙ্গ খেতে পছন্দ করে। আবার কোনো কোনো পাখি, যেমন— কাক, চিল ইত্যাদি নোংরা-ময়লা খায়; চিল-শকুন-কাক মরা-পঁচা খেয়ে পরিবেশ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা তো ইতোমধ্যেই জেনেছো যে, আমাদের এই প্রিয় দেশ থেকে এখন পর্যন্ত ১৯টি প্রজাতির পাখি চিরতরে হারিয়ে গেছে। আরও ৩৯ প্রজাতির পাখি বিপদগ্রস্ত ও ২৯ প্রজাতির পাখি প্রায়-বিপদগ্রস্ত। এসব পাখিদের বিপদের হাত থেকে এখনই রক্ষা করতে না পারলে এরাও হয়ত একদিন বিলুপ্তির খাতায় নাম লেখাবে। আর তোমরা নিশ্চয়ই তা চাও না। একটি কথা মনে রেখো আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে এসব বিপদগ্রস্ত পাখিদেরও রক্ষা করতে হবে বিপদের হাত থেকে। আর এ কাজে বড়োদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। পাখি ও এদের আবাস সংরক্ষণ করতে তোমারও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারো। পাখি সংরক্ষণে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারো তোমরাই।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় পাখি

শরীফ খান

ও সাদা পেলিক্যান, তোমরা কেন হারিয়ে যাচ্ছ! তোমাদের মন খারাপের ছবি তুলেছেন ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

পাখিরা হলো প্রকৃতির উড়ন্ত-দুরন্ত সৌন্দর্য। কত সুন্দর সুন্দর রং ও রঙের মিশেলে যে প্রকৃতি সাজিয়েছে ওদেরকে মনের মাধুরি মিশিয়ে! যেন বা, রংতুলি দিয়ে পাখিদের শরীরে মাখিয়েছে সুন্দর সুন্দর রং। অনেক পাখির সৌন্দর্য দেখলে মুগ্ধ হতেই হয়। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ওদের চলাফেরা ও ওড়াউড়ির কায়দা দেখেও মন ভরে যায় আনন্দে।

এককালে যে পাখিটি আমাদের এই সোনার বাংলাদেশে ছিল, এখন কিন্তু নেই। হতে পারে পাখিটিকে আজ থেকে ৫০ বছর আগেও দেখা যেত, এখন আর দেখা মেলে না। ১০০ বছর আগে হয়ত আরো বেশি সংখ্যায় ছিল। এই যে বাংলাদেশের সীমানা থেকে হারিয়ে গেল পাখিটি, এটিই হলো বিলুপ্ত পাখি।

বিলুপ্তির কয়েকটি কারণ

আবাসভূমি তথা বাসস্থান ধ্বংস হওয়া, খাদ্য সংকট, মাংসের লোভে নির্বিচার শিকার (যে পাখিগুলো বাংলাদেশ থেকে আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে তার অধিকাংশের কারণ শিকার) ও বাসা বেঁধে ডিম-ছানা তোলার অনুকূল পরিবেশের অভাব। একমাত্র খাদ্য সংকটের কারণেই এদেশ থেকে ৪০/৫০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সুদর্শন মোরগ শকুন বা রাজশকুন (Red-headed Vulture, দৈর্ঘ্য ৮৫ সেমি), অথচ ৫০/৬০ বছর আগেও এদের দেখা মিলত সারা বাংলাদেশে। যেসব মানুষের বয়স এখন ৫০-৭০ বছরের কোটায়, তাদের অধিকাংশ দেখেছেন এই মোরগ শকুনটিকে। রাজশকুন বা রাজা শকুন নামেও পরিচিত ছিল এটি। জঙ্গি বিমানের মতো বাতাসে সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে আকাশে নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে নেমে আসত মরা গরু-মহিষের পাশে। শকুন বা সাধারণ শকুনেরা (White-rumped Vulture, ওজন ৪ কেজি) এদেরকে সমীহ করে চলত। শকুনের চেয়ে মোরগ শকুনের ঠোঁট বেশি তীক্ষ্ণ ও ধারালো হওয়ায় ওরা সহজেই গরু-মহিষের চামড়া ফুটো করতে পারত, যা শকুন বা সাধারণ শকুনের পক্ষে ছিল প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। মোরগ শকুন

ও অন্যান্য শকুনেরা যখন একযোগে হামলে পড়ত মড়ার উপরে, তখন দারুণ দৃশ্যের অবতারণা ঘটত। শিশু-কিশোররা প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহলে শকুনদের মড়া খাওয়ার নানান রকম মজাদার দৃশ্য উপভোগ করত। ঢিল ছুঁড়ে শকুন তাড়ানোর চেষ্টা করত। কুকুর লেলিয়ে দিত। কিন্তু বাংলাদেশের আজকের শিশু-কিশোররা ওই দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। নীল ময়ূরও বাংলাদেশে ৬০-৮০ বছর আগে ছিল। ওরা বাস করত বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ মধুপুরের শালবন সহ, রাজশাহী অঞ্চলের শালবন ও অন্যান্য বনে। আমাদের বাংলাদেশে সর্বশেষ নীলগলা ময়ূরের দেখা মেলে ১৯৮৭ সালে, ঢাকা শহরের অদূরে শ্রীপুরের রাথুরা শালবনে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখি হলো এই অনিন্দ্য সুন্দর নীলগলা ময়ূর। এরা যে-রকম বড়ো আকারের বড়ো পাখা সদৃশ পেখম মেলতে পারে, পৃথিবীর অন্য কোনো পাখি তা পারে না। অথচ, পাখিটি এখন আর বাংলাদেশে নেই। এটি ভারতের জাতীয় পাখি। বাংলাদেশে টিকে থাকলে হয়তবা বাংলাদেশেরও জাতীয় পাখি হতো এটি। এটির বিলুপ্তির মুল কারণ মাংস খাবার লোভে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিকারসহ অন্যান্য শিকারিদের শিকার। বাসা করে মাটিতে। ডিম পাড়ে ৪-৬টি। এই ডিম চুরি করেও খেয়েছে মানুষ। টিকে থাকবে কীভাবে?

আজকের আগ্রহী শিশু-কিশোররা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখে আসতে পারে নীলগলা ময়ূরকে। নীলগলা ময়ূরের ইংরেজি নাম Common Peafowl. দৈর্ঘ্য- ময়ূর ১৮০-২৩০ সেমি ও ময়ূরি ৯০-১০০ সেমি। ময়ূরের পেখম তোলার জন্য লম্বা লেজ ও পালক থাকে। ময়ূরির লেজ ও পালক থাকে না। ময়ূরের আরেক জাতভাই বর্মী ময়ূর ছিল বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলা-পাহাড়ি বনে। এখন বিলুপ্ত। বিলুপ্তির কারণ নীলগলা ময়ূরের মতো একই। বর্মী ময়ূরের ইংরেজি নাম Green Peafowl. দৈর্ঘ্য- ময়ূর ১৮০-৩০০ সেমি ও ময়ূরি ১০০-১১০ সেমি। অর্থাৎ, নীলগলা ময়ূরের চেয়ে বড়ো। তবে, সৌন্দর্য বিচারে নীলগলা-ই সেরা।

বহুবছর আগে আমাদের রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দেখা মিলত অতি সুন্দর বুনোহাঁস, বাংলার গোলাপি শির (গোলাপি মাথা) হাঁসের। এখন বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে পাখিটি।

পাখির পরিভাষা

পাখির প্রাচুর্য, আধিক্য ও বর্তমান অবস্থা জানতে হলে কিছু কিছু পরিভাষার (Terminology) সঙ্গে তোমাদের পরিচিত হতে হবে।

যে-পাখি সঠিক মৌসুমে সঠিক আবাসস্থলে সবসময়ই দেখা যায় বা সঠিক মৌসুমে সঠিক আবাসস্থলে পাখিটিকে দেখার সম্ভাবনা যদি ৭৬-১০০% হয় তবে সেই পাখি 'বহুল দৃশ্যমান (Very common)' পাখি হিসেবে বিবেচিত।

তেমনি পাখিটিকে দেখার সম্ভাবনা যদি ৫১-৭৫% হয় তবে সেই পাখি 'সচরাচর দৃশ্যমান (Common)' পাখি হিসেবে বিবেচিত।

আবার সঠিক মৌসুমে সঠিক আবাসস্থলে কোনো দক্ষ পাখি পর্যবেক্ষণকারীর (Bird Watcher) একবারের ভ্রমণে যে পাখিকে অন্তত একবার দেখা যায় বা দেখার সম্ভাবনা যদি ২৬-৫০% হয় তবে সেই পাখিকে 'দুর্লভ (Uncommon)' পাখি বলা হয়।

সঠিক মৌসুমে সঠিক আবাসস্থলে কোনো পাখি দেখার জন্য যদি বারবার যেতে হয় অথবা দেখার সম্ভাবনা যদি ২৫%-এর কম হয় তবে সেই পাখিকে 'বিরল (Rare)' পাখি বলে।

অন্যদিকে, সারাদেশে যে পাখি গত ১০ বছরের মধ্যে ২ বারের বেশি দেখা যায়নি সেটিকে 'অনিয়মিত (Vagrant)' পাখি বলা হয়।

এছাড়াও পাখির বর্তমান অবস্থা বোঝানোর জন্যও বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

যেমন– 'বিপদমুক্ত (Not Threatened)', 'প্রায় বিপদগ্রস্ত (Near Threatened)' ও 'বিপদগ্রস্ত (Threatened)'। এসব বিপদগ্রস্ত পাখির বিপদের ধরন বোঝানোর জন্য 'সংকটাপন্ন (Vulnerable)', 'বিপন্ন

(Endangered)' ও 'মহাবিপন্ন (Critically Endangered)' শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়।

আবার যে-সব পাখি এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে, আর কখনো দেখা যাবে না তাদেরকে বলা হয় 'বিলুপ্ত (Extinct)' পাখি। যে-সব পাখি একটি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছে সেগুলো 'স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত (Regionally Extinct)' পাখি হিসেবে বিবেচিত।

আবার মহাবিপন্ন পাখিগুলোর মধ্যে যেগুলো বিলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে সেগুলো 'বিলুপ্ত প্রায় (Near-Extinct)' পাখি বলে বিবেচিত।

যে-সব পাখির আবাসস্থল সহসা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা নেই বা পাখিগুলো বিলুপ্ত হওয়ার তেমন কোনো আশঙ্কা নেই সেগুলো 'স্বল্প ঝুঁকিসম্পন্ন (Least Concern)' পাখি হিসেবে পরিচিত।

এছাড়াও যে-সব পাখির অবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে তাদেরকে 'তথ্য-অপ্রতুল (Data Deficient)' পাখি বলে গণ্য করা হয়।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংস্থা, বাংলাদেশ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Bangladesh or IUCN, Bangladesh) এ দেশের প্রায় ৭০০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৫৬৬ প্রজাতির পাখির অবস্থা সম্পর্কে জরিপ করে দেখেছে যে, বর্তমানে ১৯ প্রজাতির পাখিই এ দেশ থেকে বিলুপ্ত (অবশ্য গোলাপি শির পুরো পৃথিবীতেই বিলুপ্ত) হয়ে গেছে। বাকিগুলোর মধ্যে ২৯ প্রজাতি প্রায়-বিপদগ্রস্ত, ৩৯ প্রজাতি বিপদগ্রস্ত, ৫৫ প্রজাতি তথ্য-অপ্রতুল ও ৪২৪ প্রজাতি স্বল্প ঝুঁকিসম্পন্ন শ্রেণিতে রয়েছে।

বিলুপ্ত আরেকটি পাখি হলো হাড়গিলা। এক সময় কলকাতা পৌরসভার প্রতীক মনোগ্রামে এই পাখিটির ছবি ছিল। এদের গলায় বড়োসড়ো (লম্বা) বেগুনের আকারের একটি গলথলি আছে। বিশাল আকৃতির পাখি। বাংলাদেশে এটি বিলুপ্তির মূল কারণ হচ্ছে শিকার। এদের দেখা মিলত বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই। হাড়গিলার ইংরেজি নাম Greater Adjutant. দৈর্ঘ্য ১২০-১৫০ সেমি। ওজন ৫-৮ কেজি।

আরেকটি বিলুপ্ত পাখি হচ্ছে গগনবেড়। বিশাল আকারের সাদা পাখির ঠোঁটটিও ছিল বড়োসড়ো। এটি ছিল পরিযায়ী পাখি। দেশের বড়ো বড়ো হাওরে এদের দেখা মিলত। ব্যাপক শিকারের কারণেই বিলুপ্ত এটি। গগনবেড়ের ইংরেজি নাম Great White Pelican. দৈর্ঘ্য ১৪০-১৮০ সেমি। ওজন ৯-১৫ কেজি। বন্দুকের একটা গুলিতে ১৫ কেজি মাংস! কে ছাড়ে এই সুযোগ! কিন্তু বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে যে-কোনো পাখি শিকার, ধরা, মারা ও পোষা দণ্ডনীয় অপরাধ।

এছাড়া বিলুপ্ত পাখির তালিকায় আরো আছে ডাহর বা বাংলার ফ্লোরিক্যান বা কেয়ার তিতির। এদের বসবাস ছিল সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে। এদের ইংরেজি নাম Bengal Florican.

বিলুপ্তপ্রায় পাখি কারা

যে-সব কারণে একটি পাখি একটি দেশ বা সেই দেশের নির্দিষ্ট একটা অঞ্চল বা একটি উপজেলা বা গ্রাম থেকে বিলুপ্ত হয়, বিলুপ্ত হয় দেশটি থেকেই, সে-সব কারণে আজো বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয়নি বটে, তবে হবার পথে অথবা চলে গেছে দেশ ছেড়ে। মাঝেমধ্যে হঠাৎ স্বদেশে আসে বেড়াতে। বলা যায় জন্মমাটির টানে, সেগুলোই হলো বিলুপ্তপ্রায় পাখি। যেমন– মানিকজোড় পাখি (Woolly-necked Stork, দৈর্ঘ্য ৯০-১২৫ সেমি, ওজন সাড়ে তিন কেজি)।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মানিকজোড় পাখি ছিল আমাদের একান্তই আবাসিক পাখি। মাঝখানে তো মনে করা হয়েছিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে ওরা। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাগেরহাট অঞ্চলে ওদেরকে দেখা গেছে (মোট ১৪টি পাখি)। রাজশাহীর পদ্মার চরেও দেখা মিলেছে।

এদের এদেশ ছেড়ে যাবার মূল কারণ বন্দুক শিকারিদের বেপরোয়া শিকার। বাংলাদেশে যদি পাখি শিকার বন্ধ করা যেত, তাহলে মানিকজোড় আবারো বাসা বাঁধত এই সোনার বাংলাদেশে, এমন বিশ্বাস করা যেতেই পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাদা মানিকজোড় নামে (Oriental Stork, দৈর্ঘ্য ১৫০ সেমি) ২০০৮ সাল পর্যন্ত শীতে বাগেরহাটের ফকিরহাটের হাওরে আসত। এখন আসে না। আসবে কী আর!

উদাহরণ হিসেবে শামুকভাঙা পাখির (Asian Openbill, দৈর্ঘ্য ৬৮-৭০ সেমি, ওজন সাড়ে চার কেজি) বলা যায়। ওরাও ছিল আমাদের আবাসিক পাখি। বড়ো বড়ো ঝাঁকে চলত। মাঝখানে বহু বছর বাংলাদেশে ওদের বাসা দেখা যায়নি। তবে, এমনিতে মাঠ-বিল-হাওর- বাঁওড়ে দেখা যেত। অনেকেই বলতে শুরু করেছিল ওরা পরিযায়ী পাখি। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে দিয়ে গত প্রায় এক যুগ ধরে ওদের বাসা নিয়মিত দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায়।

বছর দশেক আগের কথা। পিরোজপুর জেলার চরখালী গ্রামের একটি কাঠবাদাম ও শিমুলগাছে (গাছ দুটি পাশাপাশি-লাগালাগি ছিল) বাসা বেঁধে ডিম-ছানা তুলেছিল। এক গৃহবধূ একদিন একটি বাচ্চা মাটিতে পড়া অবস্থায় পায় (বাচ্চা খুব দুষ্টু তো! ভাইবোনদের সঙ্গে দুরন্তপনা করতে গিয়ে এরকমভাবে বাসা থেকে বহু পাখির বাচ্চাই গাছতলায় পড়ে যায়)। গৃহিণী ওটিকে লালনপালন করেন। এক সময় পাখিটি বড়ো হয়ে যায় এবং একদিন উড়ে গিয়ে গাছে চলে যায়। মিশে যায় ঝাঁকে। ওই গৃহিণীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, দেখেছিলাম পাখিটিকে। সেই গৃহিণী ও পাখিটির ছবি আমার সংগ্রহে আছে।

আরো একটি সুন্দর রংচঙা পাখি রঙিলা বক আমাদের দেশে আসত শীতকালে। এটি পরিযায়ী পাখি, দু-চারশ বছর আগে এটি হয়ত আমাদের আবাসিক পাখিই ছিল। মাঝখানে বহু বছর ধরে ওদের কোনো খোঁজখবর না থাকায় এটিকে বিলুপ্ত বলা হয়েছিল। কিন্তু গত ২০১৩ সালে এদেরকে দেখা যায় মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওরে ও ২০১৫-১৭ সালে রাজশাহীর পদ্মার চরে। এটির ইংরেজি নাম Painted Stork. দৈর্ঘ্য ১০২ সেমি, ওজন সাড়ে তিন কেজি।

মানিকজোড় ও রঙিলা বক বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় পাখি এখন, মোটেই বিলুপ্ত নয়। ৫০-৭০ বছর আগেও এ দুটি পাখিকে সারা বাংলাদেশে দেখা যেত।

লৌহজঙ্গ (রামশালিক, লোহারজঙ্গ নামেও পরিচিত। ইংরেজি নাম Black-necked Stork দৈর্ঘ্য ১৫০ সেমি। ওজন ৪ কেজি) নামের পাখিটিও পরিযায়ী। এটিকেও বিলুপ্ত বলে মনে করা হতো। কিন্তু ২০১৬-১৭ সালে বহু বছর বাদে এদের দেখা মিলেছে রাজশাহীর পদ্মার চরে। অতএব, বিলুপ্ত নয়, বিলুপ্তপ্রায় পাখি এটি।

ছবি: ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

কালাজাং (Black Stork, দৈর্ঘ্য ৯০-১০০ সেমি, ওজন সাড়ে তিন কেজি) নামের বড়োসড়ো পাখিটিও পরিযায়ী। বহু বছর ওরা আসেনি। কিন্তু ২০১৩-১৭ সাল পর্যন্ত ওদেরকে বেশ ক'বার দেখা গেছে রাজশাহীর পদ্মার চরে। এটিও তাই বিলুপ্ত প্রায় পাখি।

ধূসর সারসও (Demoiselle Crane, দৈর্ঘ্য ১০০ সেমি, উচ্চতা ৭৬ সেমি) বাংলাদেশে বিলুপ্ত বলে ঘোষিত ছিল। কিন্তু ২০১০-১১ সালে একটি পাখি বৃহত্তর সিলেটের একটি হাওরে এক বন্দুক শিকারির গুলিতে মারা পড়ে। যেহেতু পাখি শিকার বাংলাদেশে

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেহেতু শিকারিকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ধূসর সারস তাই বিলুপ্ত নয়, বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

এছাড়াও সারস প্রজাতির অন্যতম সুন্দর লালমাথা সারস (Surus Crane, দৈর্ঘ্য ১৫৬ সেমি, উচ্চতাও ১৫৬ সেমি) আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগেও বাংলাদেশে আসত। এখন আসে না। কিন্তু আসতেও পারে আবার হুট করে! তাই এটি হলো বিলুপ্তপ্রায় পাখি। 'সারস নৃত্য' বলতে যা বোঝায়, সেই ধ্রুপদী নাচ।

পাখির ছানারা হয় দুষ্টু। একটু বড়ো হয়ে ভাইবোনেরা বাসায় বসে খুনসুটি করে। ঝগড়া-বিবাদ করে। মারামারিও করে। এজন্য মা-বাবা পাখি ছানাদের ধমক দেয়, ঠোকরও দেয়। দূরে বসে শাসায়ও। এমনিতে পাখির ছানাদেরতো শত্রুর অভাব নেই। ওরা কিন্তু মা-বাবার নানান রকম ভাষা ভালোভাবে বুঝতে পারে। তবে, পাখির ভাষা পাখিরাই বোঝে। পাখিরা কিন্তু ছানাদের শারিরীক ভাষা বা ইশারা ভাষা বেশি বেশি দেখায়। যেমন- শত্রু! উড়াল দাও, না হলে মহাবিপদ! ওদিকে যেও না! এদিকে এসো! একদম চুপ করে বাসায় বসে থাকো! ইত্যাদি ইত্যাদি। কণ্ঠ দিয়েও ছানাদের সতর্ক সংকেত যেমন দেয়, তেমনি চুপ থেকেও সতর্ক সংকেত দেবার কৌশল জানে। ছানারা মা-বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

একেক প্রজাতির ভাষা (ডাক-গান ইত্যাদি) একেক রকম। তবুও বংশগতির ধারায় ও বাস্তবতার ভেতর দিয়ে প্রত্যেক প্রজাতির পাখি প্রত্যেক প্রজাতির পাখির ভাষা বোঝে। প্রায় প্রত্যেক পাখিরই আছে 'বাসা বাঁধা গান', 'বাসায় ডিম-ছানা হবার খুশির গান'। মানব শিশু জন্ম নিলে যেমন তার মা-বাবা-ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনরা খুশি হয়- পাখিরাও কিন্তু তার চেয়ে বেশি কম কিছু হয় না।

পাখির জগৎ মজার জগত। পাখির জগৎ রহস্যময় জগত।

নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরা নাচ, চোখ জুড়ানো ও মন ভুলানো নাচ এরাই জানে। জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি হয়ে নাচে। লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে। হায়রে সারস নৃত্য! ব্যালে নৃত্যও বলা যায়।

চিতিঠোঁট গগনবেড় (Spot-billed Pelican, দৈর্ঘ্য ১৫২ সেমি) ছিল আমাদের পরিযায়ী পাখি। দেখা যাচ্ছে না বহু বছর ধরে। তবুও বিলুপ্ত বলার সময় আসেনি এখনো। এটিও বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

শকুন বা সাধারণ শকুন (গিন্নি শকুন নামেও পরিচিত, গলা ছিলা বা পালকহীন! ইংরেজি নাম White-rumped Vulture, দৈর্ঘ্য ৯০ সেমি, ওজন প্রায় সাড়ে চার কেজি) ১৯৭১-৭৭ সাল পর্যন্ত সারা বাংলাদেশেই ছিল।

অথচ, এই ২০১৭ সালে ওরা এখন বিলুপ্তপ্রায় এ দেশ থেকে। দেশের দু'একটি অঞ্চলে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, দু-চারটি বাসাও নজরে পড়ে। কিন্তু কেন?

মূল কারণ প্রবল খাদ্য সংকট। আজকাল উন্নত চিকিৎসার কারণে গবাদি পশুর মৃত্যুহার অনেক কমেছে। তারপরেও দু-পাঁচটা যা-ও মরে, স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে মাটি চাপা দেওয়া হয়। অতএব শকুনের খাবার নেই। খাবার না থাকলে শকুন কেন, কোনো প্রাণীই সেখানে থাকে না।

অথচ, একটি পাখি প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হলে অপূরণীয় ক্ষতি হয় প্রকৃতি ও পরিবেশের- যার দায় অবশ্যই

পাখিদের কবিতা

ইসরাত জাহান

চিল ওড়ে আকাশ পানে
গঙ্গা ফড়িং সবুজ ঘাসে
ঘুঘু ডাকে ধানের ক্ষেতে
ঐ পানা পুকুরের পাশে।

বাবুই পাখি খেজুর গাছে
আঙিনাতে চড়ুই নাচে
আম গাছে কোকিল ডাকে
দোয়েল গায় গাছে গাছে।

পুকুর পাড়ে মাছরাঙা
বসে পোনা মাছ ধরে
পায়রার দল ঝাঁকে ঝাঁকে
বাড়ির উঠোনে খেলা করে।

দ্বাদশ শ্রেণি, মডেল ডিগ্রি কলেজ, চাঁদপুর

ভোগ করতে হয় মানুষকে। কেননা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ পাখিরা। মাঝখানে একটা শুন্যতা সৃষ্টি হলে ভারসাম্য নষ্ট হয় প্রকৃতির। যার ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের জন্য চরম বিনাশীও হতে পারে।

গ্রামবাংলার মানুষের ঘুম ভাঙে আজো পাখিদের গান শুনে, ঘুম থেকে জাগলেও কানে আসে নানান রকম পাখির সুরেলা গানের শব্দ। এরকম সৌভাগ্য পৃথিবীর সব মানুষের নেই।

শেষ কথা

তোমরা তো খুব ছবি আঁকতে চাও, কেউ কেউ নিয়মিত ছবি আঁকা শিখতে যাও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। অংশগ্রহণ কর নানা রকম প্রতিযোগিতায়। কিন্তু শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবির ভেতরে ফুল-পাখি ও প্রজাপতির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অথচ, ফুল-পাখি ও প্রজাপতিকেই প্রকৃতি মনের মাধুরি মিশিয়ে সবচেয়ে সুন্দর রঙে সাজিয়েছে।

আজকের শিশু-কিশোররা সবাই যে ফুল-প্রজাপতি দেখেনি বা চেনে না, তা কিন্তু নয়। পাখি দেখেও অনেকে চিনে না। তবে সংখ্যায় খুবই কম। দেশের কোনো বিখ্যাত শিল্পীকে যদি শিশু-কিশোরদের জন্য এমন একটি বা একাধিক পাখির ছবি আঁকতে বলা হয়, যেটা তিনি ভালোভাবে দেখেননি, সেটার ছবি তিনি আঁকতে পারবেন না। কেননা, পাখিটির শরীরের কোথায় কোন্ রং আছে, তা তিনি জানেন না। একটি শ্যামা পাখির ছবি তিনি কিছুতেই শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে আঁকতে পারবেন না, যিনি শ্যামা পাখি দেখেননি। পাখির ফিল্ড গাইড দেখে আঁকলেও সেটা ষোলো আনা সঠিক হবে না।

আমাদের শিশু-কিশোরেরা তাই বড়োদের সঙ্গে সুযোগ মতো প্রকৃতি ভ্রমণে যেতে পারে। শহরের শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রযোজ্য। শিশু-কিশোরেরা প্রকৃতি দেখবে, পাখি-ফুল-প্রজাপতি দেখবে। নাম জানবে সব কিছুর। প্রকৃতি স্নানে সবাই মনের ভেতরটা ধুয়ে নেবে, তাহলে থাকা যাবে তরতাজা-চনমনে। গ্রামবাংলার শিশু-কিশোররা অবশ্য এমনিতে অনেক কিছু চিনে ফেলে। তারা পাখিদের গানের শব্দে বলতে পারে, কোন্ পাখির গান ওটা। চেষ্টা করলে ও ইচ্ছা থাকলে শহুরে শিশু-কিশোররাও ধীরে ধীরে সবকিছু চিনতে- জানতে ও বুঝতে পারবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর পাখির মধ্যে লম্বালেজের ছেলে ময়ূর কে না চেনে?

সেই ময়ূরের ছবি এঁকেছে পারিজাত রানী শ্রেয়সী। ও পড়ে রাজধানী আইডিয়াল স্কুলে, ২য় শ্রেণিতে।

বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ'র আঁকা 'গমক্ষেতে কাক'

রংতুলিতে পাখি!

জাহিদ মুস্তাফা

পাখি নিয়ে কত কবিতা হয়েছে লিখিত, কত গান হয়েছে গীত– সে হিসাব মেলানো যাবে না। তেমনি চিত্রকরের চিত্রপটে কত পাখির ঠাঁই হয়েছে তা ঠিকঠাক বলা ভারি কঠিন! তবে ধারণা করি– সব পাখি এক হলে স্যার আলফ্রেড হিচককের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'দি বার্ডস'কে ছাড়িয়ে যাবে নিশ্চিত।

দুনিয়া জুড়ে খ্যাতিমান অনেক চিত্রশিল্পীই পাখির ছবি এঁকেছেন। পাখিকে প্রধান করেও এঁকেছেন কেউ কেউ। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিত্রপটে পাখি এসেছে পরিবেশের অনুঘটক হিসেবে। শিল্পী সুন্দর একটা দৃশ্য এঁকেছেন, অথচ তাতে মানুষ নেই কিংবা পশুপাখি নেই। এটি ঠিক বাস্তবসম্মত মনে হবে না। সেটি হবে অতিপ্রাকৃত বা স্যুররিয়ালিস্টিক।

প্রস্তরযুগে পশু শিকারের টোটেম বিশ্বাসে ভর করে গুহার ভেতরে শিল্পের শুরু শিকারযোগ্য পশুর ছবি এঁকে। পাখির ছবি কিংবা ভাস্কর্যের দেখা পাওয়া গেছে সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতায়। প্রাচীন ভারতের শিল্পীদের কাজেও পাখির প্রতীকী প্রয়োগ বিস্তর দেখা গেছে। প্রাচীন শাসকের ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতার প্রতীক হিসেবে ঈগল আর বাজপাখির প্রয়োগ দেখি শাসকের আসনে– সিংহাসনে।

প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ হয়ে রেনেসাঁ ও রেনেসাঁ পরবর্তীকালে কারু ও দারুশিল্পীদের হস্তশিল্পের নানা নকশায় উঠে এসেছে পাখির অবয়ব। রেনেসাঁ পূর্ব ও উত্তরকালের শিল্পীদের অসংখ্য শিল্পকর্মে পাখির অবয়ব এসেছে নানা উপায়ে, নানা প্রকারে। কখনো প্রতীক হয়ে, কখনো চিত্র গঠনের সহচরিত্র হয়ে।

রেনেসাঁ উত্তরকালের খ্যাতনামা জার্মান চিত্রকর পিটার পল রুবেন্সের ১৬১৮ সালে আঁকা– প্রমিথিউস বাউন্ড নামের পেইন্টিংয়ে গ্রিক দেবতা প্রমিথিউসের বুকের রক্তপানরত ডানা ছড়ানো বিশাল শক্তিধর বাজপাখিকে দেখা যায়। প্রাচীন কিংবদন্তীকে চোখের সামনে তুলে এনেছেন শিল্পী। এটি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কী দারুণ আঁকতেন, দেখেছ? ফরাসি চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো'র আঁকা সাদা পায়রা আজ বিশ্বশান্তির প্রতীক।

জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বাজপাখি এখানে অমঙ্গলের প্রতীক। আবার বর্ণিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত দৃষ্টিনন্দন অসংখ্য ময়ূর, সারস, পায়রা, টার্কিস পাখিও এঁকেছেন শিল্পীরা। ফরাসি ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী ক্লদ অস্কার মানেও তাঁর চিত্রকর্মে পাখির ছবি এঁকেছেন । পল গগ্যাঁ তাহিতি দ্বীপের বর্ণিল নিসর্গের পটভূমিতে ময়ূরসহ নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন।

তুমুল প্রতিভাবান পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যানগগের গমক্ষেতে কাক, গমক্ষেতে লার্ক, দ্য সোয়ার এসব চিত্রকর্মে আমরা পাখির বিস্তর ব্যবহার দেখি। ভ্যানগগ পরিবেশের বাস্তবতা আনতে এর বহুল প্রয়োগ করেছেন। বিস্তীর্ণ গমক্ষেতের আকাশ ঘিরে পাখির ছন্দময় উড়াউড়ি বড়ো মনোহরভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পী।

১৮৮৬ সালে ইতালীয় শিল্পী জন উইলিয়াম ওয়াটারহাউজ আঁকলেন– জাদুচক্র নামে এক ছবি। কোনো এক অভিজাত নারী খোলা জায়গায় কিছু রাঁধছেন। তার আশপাশে এমনকি গরম ডেকচির ওপর বসে আছে পাখি। ব্রিটিশ ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পী উইলিয়াম টার্নারের চিত্রকর্মে পাখির দেখা পাওয়া যায়। 'পৃথিবী স্বর্গ' শিরোনামে পাখপাখালি নিয়ে এঁকেছেন পিটার ওয়েনজেল। ১৬২৮ সালে রোলান্দো জ্যাকবস সাভেরি এঁকেছেন পাখিসহ ভূ-দৃশ্য। জর্জ ইক্রেস এঁকেছেন- হোম অব দ্য হিরন। পারস্য ফুল ও গানের পাখি এঁকেছেন মার্টিন জনসন হেডি। বাদশাহি হেরেমের নারী ও পায়রার ছবি এঁকেছেন ফরাসি শিল্পী জ্যাঁ লিও জেরোমি। আধা বিমূর্তভাবে পাখির ছবি এঁকেছেন শিল্পী ফ্রাঞ্জ মার্ক। পাখি শিকারের ছবিও এঁকেছেন কোনো কোনো শিল্পী।

উনবিংশ শতকের কৃতী জাপানি শিল্পী কাৎসুসিকা হকুসাই চেরি ও বুলফিঞ্চ শিরোনামে ছবি এঁকেছেন। অনেককাল আগে থেকেই চীনা শিল্পীদের চিত্রকর্মে প্রকৃতির সঙ্গে পাখি একটি প্রিয় বিষয় হিসেবে সুপরিচিত।

ইংরেজ শাসনামলে ভারতবর্ষের শিল্পী রাজা রবিভার্মা (১৮৪৮-১৯০৬) হিন্দু দেবদেবীদের অনেক ছবি এঁকেছেন পাশ্চাত্য ধরনে। তিনি দময়ন্তীর ছবি এঁকেছেন, তার সাথে এঁকেছেন রাজহাঁস। একাধিক ছবিতে হাঁসের সাথে দময়ন্তীর সখ্যতা ও বাৎসল্য চিত্রিত করেছেন শিল্পী।

স্পেনে জন্মগ্রহণকারী বিশ্ব সেরা চিত্রকর পাবলো রুইজ ই পিকাসোর (১৮৮১-১৯৭৩) আঁকা সাদা পায়রা বিশ্বব্যাপী আজ শান্তির প্রতীক। ১৯৩১ সালে তিনি আঁকেন পায়রা হাতে শিশুর ছবি।

আমাদের আধুনিক চারুশিল্পের পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের (১৯১৪-১৯৭৬) চিত্রকর্মে প্রচুর কাকের ব্যবহার দেখা যায়। গত শতকে ব্রিটিশ শাসনামলে সেই তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় অভাবতাড়িত হাড় জিরজিরে মানুষের সাথে কুকুর আর কাকের খাবার সংগ্রহের স্কেচ আজো আমাদের

পীড়া দেয়। জয়নুল পরেও আরো কাক এঁকেছেন। তাঁর আঁকা এতটাই প্রভাব বিস্তার যে, কবির ভাষায় কাকের নাম হয়েছে জয়নুলি কাক!

কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, এস এম সুলতান প্রথম প্রজন্মের প্রমুখ শিল্পীদের বিভিন্ন চিত্রকর্মে পাখি এসেছে। কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৯) প্রচুর এঁকেছেন নানারকম পাখির অবয়ব। এমনকি তাঁর আঁকা বিখ্যাত চিত্র তিনকন্যার পেছনের প্রকৃতিতে পাখির ছবি এঁকেছেন। টিয়ে পাখি হাতে নারী, দুটি গরুর সাথে কয়েকটি শালিকের মজাদার এক ছবি এঁকেছেন। ময়ূরকে কেন্দ্র করে থাকা দুটি টিয়ে পাখি এবং রং ও রেখার সহজ সাবলীল প্রয়োগে ঘাস ও ফুলের প্রেক্ষাপটে চমৎকার এক ছবি এঁকেছেন কামরুল।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অনেক চিত্রকর্মে বাংলা প্রকৃতির সহায় হয়ে পাখির ব্যবহার হয়েছে। সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী,

পাখি নিয়ে হামিদুজ্জামান খানের দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য দেখতে পাবে ঢাকার গুলশান লেকের গোল চত্বরে।

আবদুস শাকুর শাহ্‌র চিত্রকলায় পাখি এসেছে ঘুরেফিরে। হাশেম খানের নিসর্গ নির্ভর ছবিতে পাখি এসেছে পরিবেশের অনুষঙ্গ হয়ে। রাজকীয় ভঙ্গির বর্ণিল মোরগ কার না ভালো লাগে। এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তর এঁকেছেন রফিকুন নবী। জলরঙের ওয়াশে দারুণ দক্ষতায় তিনি পাখির ছানা এঁকেছেন অনেক বার।

ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান পাখি নিয়ে দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য গড়েছেন, যেটি গুলশান লেকের গোল চত্বরে শোভা পাচ্ছে। শাকুর শাহ্ ময়মনসিংহ গীতিকার নানা চরিত্র নিয়ে ছবি আঁকেন। এইসব ছবির গঠন বিন্যাসেও ঘটনাক্রমে নানা পাখির প্রয়োগ করেছেন শিল্পী। এ ছাড়াও পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পী আবদুল মান্নান, ফরিদা জামান, রণজিৎ দাস, মোহাম্মদ ইউনুস, জামাল আহমেদ, শেখ আফজাল, শিশির ভট্টাচার্যের কাজে আমরা পাখির ব্যবহার দেখি।

প্রাচ্যকলা নিয়ে যাঁরা আঁকছেন, যেমন আবদুস সাত্তার, রফিক আহমেদ, নাসরীন বেগম, আফরোজা জামিল, আবদুল আজিজ, ড. মলয় বালা, গুপু ত্রিবেদী , তারিক ফেরদৌস খান প্রমুখ শিল্পীর চিত্রপটে পাখির প্রয়োগ হয়েছে বারবার।

ঢাকা শহরে ঘুরলে দেখতে পাবে পাখি নিয়ে এরকম নান্দনিক ভাস্কর্য

তোমাদের রংতুলিতে পাখি

পাখির রাজ্যে মহা আনন্দের ছবিটি এঁকেছে তানজিনা তাজরীন, ৯ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল, ঢাকা।

ডানা মেলা পাখিদের সাথে ওড়তে চায় দীপান্তলি বড়ুয়া। ওড়াউড়ির পাশাপাশি ও পড়ে ২য় শ্রেণিতে, ভিকারুন নিসাঙ্কুল অ্যান্ড কলেজ

একা একা হেঁটে বেড়ানো পাখিটির ছবি এঁকেছে, আয়ান হক ভূঁঞা, বয়স ০৪, বাসা- ২৪৮/৬/১ টিভি লিংক রোড, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।

বৃষ্টি দেখছে পাখি। এই ছবিটি এঁকেছে প্রিয়তি সালেহ উদ্দিন, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ক্রেস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, আলাবর, ঢাকা।

মগডালে বসে প্রকৃতি দেখা এই পাখিটির ছবি এঁকেছে। নাজিবা সায়েম। সে পড়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে, মাস্টার মাইন্ড স্কুল ঢাকায়।

দুই পাখির গল্প করা ছবিটি এঁকেছে সুহেইর আরাফী (তিতির), সে ৩য় শ্রেণি পড়ছে ফাউন্ডেশন স্কুল ঢাকায়।

পাখিরা কত যে ভালো

আখতার হুসেন

পাখিরা কত যে ভালো
ঘুম থেকে জাগে সকলের আগে
যখন ফোটে না আলো।

আমরা যখন ঘুমে গুটিসুটি
শুয়ে আছি বিছানায়
পাখিরা তখন ডানা মেলে দিয়ে
বহুদূরে উড়ে যায়।

মনে হয় ওরা ভোরের প্রহরী
আমাদের তোলে ডেকে
গানে গানে বলে, 'আলসে তোমরা
জেগে ওঠো ঘুম থেকে।'

ঝড়ে কিংবা বৃষ্টিবাদলে
ওরা কত নির্ভয়;
ঘর ভেঙে যায়, ঘর গড়ে তোলে,
এইভাবে টিকে রয়।

তবু গান গায়, তবু ওরা ওড়ে
গানের বিরাম নেই,
কনকনে শীত, তারপরও ওরা
যেই দেখি একই সেই।

আর আমাদের মা-মণি দেখ না
জল-ঝড় এলে পরে

'যাসনে বাইরে' বলে আমাদের
আগলে রাখেন ঘরে।

ঠান্ডা একটু লাগলে পরেই
জড়িয়ে কাঁথায়-লেপে
বলেন,'তোমরা সাবধান হও,
জ্বর এল বুঝি ঝেঁপে!'

বন্ধ রাখেন জানলা-দুয়ার
ওষুধ খাওয়ান কত,
পাখিদের মায়েরা অমন কী করে
আমার মায়ের মতো?

ভয়-পাওয়ানো গল্প বলেন
সারাদিন অফুরান
কোথা যদি যাই একটু না বলে
ডেকে ডেকে হয়রান।

ভোর থেকে সাঁঝ অবধি যে দেখি
শীতে কি বাদলে ঝড়ে
পাখিদের মা ও তাদের ছেলেরা
একইভাবে খেলা করে।

একসাথে ওড়ে, একই সাথে গায়
বহুদূরে উড়ে যায়,
মা-মণি আমার পাখিদের দেখে
কিছুই শেখে না হায়!

তাই বলি আমি পাখিরা সাহসী
পাখিরা যে ভালো কত,
আর কিছু যদি হতে না-ই পারি
হবো পাখিদের মতো।

আনিশক শীল থাকে আমেরিকাতে। ওর বয়স মাত্র চার। মন্টেসরি স্কুলে থ্রি-স্কুল করছে কেবল। পছন্দের এই পাখিদের গায়ে রং লাগিয়ে পাঠিয়েছে নবারুণের কাছে। দেখতো কেমন হলো?

আমার প্রথম পাখি দেখা

লেখা ও ছবিঃ নুজহাত জাইমা রহমান

আব্বুর মতো পাখি দেখা ও পাখির ছবি তোলার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। যখন দেখতাম পাখির ছবি তোলাটা আব্বু বেশ উপভোগ করছেন, তখন মনে হতো কাজটা বোধ হয় খুবই সোজা। মনে হতো ক্যামেরার শাটার রিলিজটা চাপলেই বোধ হয় পেশাদার ফটোগ্রাফারের মতো ছবি তোলা যায়। আব্বুর কাছে ছোটোবেলায় একদিন পাখির ছবি তোলার ইচ্ছের কথা জানালাম তিনি তখন বারান্দার বাগানে নিয়ে একটা পাখির দিকে ক্যামেরা তাক করলেন আমাকে বললেন, শাটার রিলিজে ক্লিক করতে। তখন আব্বুর হাতে ধরা ক্যামেরার শাটার রিলিজ বাটনে খুব সহজেই ক্লিক করলাম। একটা চড়ুই পাখিকে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করতে পেরে কতই না খুশি হয়েছিলাম। আর সেই থেকেই আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে ব্যাপারটা খুবই সহজ। কিন্তু ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আমার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। যখন আব্বু আমাদের বার্ডিং করানোর জন্য সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে গেলেন।

গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যারেজের পাশের বড়ো লেকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আব্বুকে দেখলাম উনার ক্যানন সেভেন ডি ডিএসএলআর ক্যামেরার (Canon 7D DSLR Camera) ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে ৩০০ মিলিমিটার প্রাইম লেন্স দিয়ে পটাপট পাখির ছবি তুলে যাচ্ছেন। আজকে আমার আউটডোরে প্যানাসনিক এফজেড ৫০ পয়েন্ট অ্যান্ড শুট ক্যামেরা (Panasonic FZ 50 Point & Shoot Camera) দিয়ে প্রথম পাখির ছবি তোলার প্র্যাকটিস।

আব্বুর পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে সমানে শাটার রিলিজে ক্লিক করে গেলাম। কিন্তু খানিক পরে আব্বুর সঙ্গে বসে ছবিগুলো যখন রিভিউ

করলাম আর আব্বুর ছবির সঙ্গে মেলালাম তখন কান্না করতে ইচ্ছে করল। একটা ছবিও ভালো হয়নি। কোনোটার ফ্রেম খারাপ, কোনোটাতে শেকিং, কোনোটা আবার ঝাপসা। মনটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেল।

বাসার বারান্দায় পাখির ছবি তোলা আর আউটডোরে ছবি তোলার পার্থক্যটা ভালোই বুঝতে পারলাম। আব্বু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, পাখির ছবি তোলার জন্য বেশ ধৈর্য্য ধরতে হয়। ওদেরকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। একটি পাখিকে টার্গেট করে গাছ বা কোনো কিছুতে হাইড নিয়ে নিঃশব্দে সামনের দিকে এগুতে হয়। তারপর পাখিটা ফ্রেমের মধ্যে ভালো একটি পজিশনে আসলে শাটার রিলিজে ক্লিক করতে হয়। কোনো পাখিকে প্রথমবার দেখলে দূর থেকেই ওর একটা সাক্ষী ছবি তুলতে হয়। এরপর আস্তে আস্তে ছবি তুলতে তুলতে সামনে এগুতে হয়। তবে ছবি তোলার সময় পাখিকে বিরক্ত করা বা ভয় দেখানো যাবে না। একটি ভালো ছবির জন্য প্রয়োজন অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করা। আব্বু একটি পাখির ভালো ছবি তোলার জন্য সতেরো বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।

যাহোক আব্বুর কথাগুলো শুনে মনটা ভালো হয়ে গেল। ওনার নির্দেশনা মতো লেকের পাখিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। পুরো লেকটা লাল শাপলা, কলমিলতা ও জলজ উদ্ভিদে ছেয়ে আছে। লেক ভর্তি ছোটো সরালি হাঁস ও অন্যান্য পাখি। মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

আব্বুর নির্দেশ মতো শাটার রিলিজে ক্লিক করে গেলাম। ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে লাল লাল শাপলার দিকে ক্যামেরা ফোকাস করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম অদ্ভুত সুন্দর এক পাখি লম্বা লম্বা পা ফেলে শাপলা পাতার উপর দিয়ে হাঁটছে। ওর লম্বা গাঢ় সবুজ পা দিয়ে লাল শাপলার থালার মতো সবুজ পাতাগুলো সগৌরবে মাড়িয়ে আস্তে আস্তে আমার ছবির ফ্রেমে চলে এল। কিন্তু জলপাই-বেগুনি পাখিটি এত দ্রুত এগিয়ে আসছিল যে তাকে কোনো ভাবেই ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করতে পারছিলাম না। এরপর হঠাৎই পাখিটি এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই আমি শাটার রিলিজে একনাগাড়ে ক্লিক করে গেলাম। রিভিউ করে দেখলাম এবার ছবি কিছুটা ভালো হয়েছে, তবে আরো চেষ্টা করতে হবে। আসল ছবিটা এখনো পাইনি। বুঝলাম পাখির ছবি তোলা এত সহজ না, আরো ধৈর্য্য ধরতে হবে।

এরপর আব্বুর সঙ্গে পাশের লেকে গেলাম। ওমা, এখানেও তো দেখি সুন্দর এই পাখিগুলো! এবার আরো কাছে পাওয়া গেল। লাল শাপলা পাতার উপর দাঁড়িয়ে কী যেন খুঁজছে।

আমি এবার ভালো ভাবে পজিশন নিয়ে ক্যামেরা জুম করে ধীরে ধীরে শাটার রিলিজে ক্লিক করলাম। হ্যাঁ, এবার বেশ ক'টা ভালো ছবি তুলতে পারলাম।

আব্বুকে দেখানের সাথে সাথে আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন, পাখির ছবি তোলার জন্য ধৈর্য্যটাই আসল। এরপর সঠিক সময়ে ক্লিক করা। এ দুটো জিনিসের সমন্বয় হলেই ভালো ছবি হবে। মনটা আমার আনন্দে ভরে উঠল।

আমার বার্ডিং জীবনের তোলা ছবি এই প্রথম পাখির বাংলা নাম জলপিপি। দলপিপি বা পিপি নামেও পরিচিত। ইংরেজি নাম Bronze-winged Jacana (ব্রোঞ্জ উইংড জ্যাকানা)। পরিবার Jacanidae (জ্যাকানিডি)। বৈজ্ঞানিক নাম *Metopidius indicus* (*মেটোপিডিয়াস ইনডিকাস*)। পাখিটির দেহের দৈর্ঘ্য ৩০ সেন্টিমিটার। আর ওজন ১৫৫ গ্রাম। মাথা, ঘাড় ও দেহের নিচের পালকগুলো চকচকে নীলচে-বেগুনি কালো। ছেলে ও মেয়ে পাখি দেখতে একই রকম। কম বয়েসি পাখির রং বড়োগুলোর থেকে বেশ আলাদা। সেদিন একটা কম বয়েসি পাখির দেখাও পেয়েছিলাম। তবে ছবি তুলতে পারিনি।

জলপিপি সচরাচর দৃশ্যমান আবাসিক পাখি। সারা দেশের হাওর, বিল, হ্রদ, পুকুর, ডোবা ও মিঠাপানির জলাশয়ে বাস করে। এরা জলজ কচি ঘাস-গুল্ম, পোকামাকড় ইত্যাদি খায়। বাঁশি বাজানোর মতো 'সিক-সিক-সিক...' শব্দে ডাকে। জুন-জুলাই মাসে ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উপর বাসা বানায়। ডিম পাড়ে ৪টি। ডিমের রং বাদামি।

শুনলে তোমরা আশ্চর্য হবে যে, মা পাখি শুধু ডিম পেড়েই খালাস, সে ডিমে তা-ও দেয় না, বাচ্চাদের লালনপালনও করে না।

এসব কাজ বাবা পাখি একাই করে। বাবা পাখি প্রায় ২৩ দিন ডিমে তা দেওয়ার পর ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে। এরপর এরা লম্বা লম্বা পা ফেলে থালা আকারের শাপলা বা পদ্ম পাতার উপর মনের আনন্দে হেঁটে বেড়ায়।

[এ লেভেল, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা।]

পাখি পর্যবেক্ষণ ও ছবি তোলার নিয়ম

মো. মারুফ রানা

পাখি আমি খুবই পছন্দ করি। আর পাখির ছবি তুলতে তারচেয়েও বেশি পছন্দ করি। ছোট্ট বন্ধুরা, আমার মতো তোমরাও নিশ্চয় রং-বেরঙের পাখি দেখতে পছন্দ করো? নিশ্চয়ই তোমাদের মনে হয়, আহা! যদি পাখিটার ছবি তুলতে পারতাম! তাহলে শোনো কী ভাবে সুন্দর সুন্দর এই পাখিগুলোর বাহারি সব ছবি তোলা যায় বলছি।

ছবি: ড. আ.ন.ম. আমিনুর রহমান

একটি কথা মনে রেখ, পাখির ছবি দেখতে যতই ভালো লাগুক না কেন পাখির ছবি তোলার কাজটি কিন্তু মোটেও সহজ নয়। কারণ, পাখিরা বেশির ভাগ সময়ই অস্থিরভাবে গাছের এ ডাল থেকে ও ডাল বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে বেড়ায়। তাই পাখির ছবি তুলতে হলে ধৈর্য্য সহকারে পাখিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তার স্বভাব বুঝতে হবে। বন্ধুরা যেহেতু তোমরা এখন ছোটো, তাই কোনো ভাবেই একা একা ছবি তুলতে বাইরে যাবে না, অবশ্যই বড়োদের সঙ্গে যাবে।

বন্ধুরা, পাখির ছবি তুলতে কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, যেমন– ক্যামেরা, লেন্স, ট্রাইপড ইত্যাদি যেগুলো হয়ত এখন অনেকের কাছেই আছে। কিন্তু যন্ত্রপাতি ছাড়াও সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যা তা হলো ধৈর্য্য। অবশ্য বাড়ির আশেপাশে যেসব পাখি দেখা যায়, যেমন– শালিক, দোয়েল, টুনটুনি, চড়ুই, বুলবুলি, কাক ইত্যাদির ছবি তোলা কিছুটা সহজ। কারণ, ওরা মানুষ দেখে অভ্যস্ত হওয়ায় মানুষকে তেমন ভয় পায় না। আর তাই এসব পাখির ছবি তুলতে তোমাদের তেমন একটা কষ্ট হবে না।

> **পাখিরা যদি বুঝতে পারে যে তুমি পাখিদের জন্য কোনো বিপদের কারণ নও তবেই তারা তোমাকে সময় দেবে ও কাছে আসবে।**

পাখি পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু নিয়মকানুন (Birding Ethics) মেনে চলতে হয়। পাখির পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, যেমন– দূষণ, বাসস্থান ধ্বংসে কীটনাশকের প্রভাব, পাখি শিকার এসব বিষয়ে আগে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবেই নিজেকে একজন প্রকৃত পাখি প্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

প্রকৃতিতে প্রতিটি পাখিরই তার নিজস্ব আকার, রং, দেহের গঠন ও ডাক রয়েছে। এই রং, আকার, গঠন ও ডাক শুনেই এদের প্রজাতি শনাক্ত করা হয়ে থাকে। প্রতিটি পাখিরই আবার ডাকের রকমফের আছে। নিজেদের মধ্যে যখন তথ্য আদান-প্রদান করে তখন তারা একভাবে ডাকে, বংশবিস্তারের সময়ের ডাক আবার অন্যরকম। এছাড়াও সতর্ক করার ডাক, উড়ার সময়ের ডাক প্রতিটি ডাকই আলাদা। এই বিভিন্ন প্রকার ডাকের সাথে পরিচিত হতে পারলে পাখি শনাক্ত করা ও পাখির ছবি তোলা অনেক সহজ হয়ে যায়।

সাধারণত সকাল ও বিকালের আলো পাখি পর্যবেক্ষণ ও ছবি তোলার জন্য উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় আলো পাখির গায়ে সরাসরি পড়ে বলে পাখির দেহের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই ছবিতে দেখা যায়। ক্যামেরার শাটারের গতি অনেক বেশি হবে ও তাতে পাখির প্রায় প্রতিটি নড়াচড়া ক্যামেরায় ধরা পড়বে।

পাখি দেখে উত্তেজিত হয়ে তাড়াতাড়ি পাখির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাখি উড়ে যায়। তবে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলে এরা অনেক সময় কাছাকাছি চলে আসে। পাখিরা যদি বুঝতে পারে যে তুমি পাখিদের জন্য কোনো বিপদের কারণ নও তবেই তারা তোমাকে সময় দিবে ও কাছে

যাবে। রংচঙে পোশাক না পরে অনুজ্জ্বল ও আশপাশের পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক পরতে হবে। পরিবেশের সাথে মিলেমিশে যায় এমন অ্যামুশ পোশাক, টুপি, গ্লাভস ইত্যাদি পরা উচিত।

এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে আবারো তোমাদের বলছি, কখনোই একা একা পাখির ছবি তুলতে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, যেসব জায়গায় পাখি পাওয়া যায় সেসব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। যেমন– সাপ, বিষাক্ত পোকা, চোরাবালি বা কাদা। তাই এসব জায়গায় দুই থেকে তিনজনের দলে গেলে ভালো হয়। তাহলে কেউ বিপদে পড়লে অন্যরা সাহায্য করতে পারবে। যেসব জায়গায় ছবি তুলতে যাবে সেসব জায়গা সকল প্রকার বিপদমুক্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই যাওয়া উচিত।

পাখি দেখার নিয়ম

ক) পাখি দেখার সময় পাখি থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। জোরে কথা বলা বা শব্দ করা উচিত নয়। তাতে পাখি ভয় পাবে না। ভয় পেলে কিন্তু সেই জায়গা ছেড়ে অন্য নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে যাবে।

খ) যে-কোনো পাখিকে খুব ভালোভাবে দেখতে হলে বিশেষ কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। যেমন– বাইনোকুলার, টেলি লেন্স, জুম লেন্স ইত্যাদি। এতে পাখি বুঝতে পারে না যে তাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

গ) পাখিকে কোনোভাবেই স্পর্শ করা উচিত নয়। পাখির বাসাতে যদি কোনো বাচ্চা বা ডিম থাকে সেগুলোও স্পর্শ করা উচিত নয়। কারণ এরা কিন্তু পোষা নয়, বুনো। তাই ছবি তোলার জন্য কোনো ভাবেই এই নিয়ম লঙ্ঘন করা যাবে না।

ঘ) যেহেতু পাখি সব সময় নড়াচড়া, লাফালাফি করে এবং এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বেড়ায় তাই ক্যামেরা Continuous Autofocus Shooting Mode-এ রাখা উচিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Aperture Priority Mode-এ ছবি তোলা ভালো। তবে শাটারের গতি (Shutter speed) 1/500 বা তার বেশি হওয়া ভালো।

ঙ) সব সময় পাখির চোখকে লক্ষ্যবস্তু বা Sharp focus-এ রাখার চেষ্টা করতে হবে।

চ) টেলিফটো লেন্স (৩০০ মিলিমিটার (মিমি), ৪০০ মিমি, ৫০০ মিমি, ৬০০ মিমি ইত্যাদি) ব্যবহার ও সাথে ট্রাইপড বা মনোপড ব্যবহার করলে ছবির গুনগত মান অনেক ভালো হয়।

ছ) ছবি তুলতে বেরোনোর সময় সাথে বাইনোকুলার, পাখি চেনার ফিল্ড গাইড, নোট বই, পেন্সিল, খাবার পানি সাথে নিতে হয়। তবে চর বা উপকূলীয় অঞ্চলে যাবার সময় সাথে অবশ্যই দড়ি ও বাঁশি (Whistle) নিতে হবে। কারণ, সেসব এলাকায় আলাদাভাবে একা ছবি তুলতে গিয়ে চোরাবালি বা কাঁদায় পড়ে গেলে, সেক্ষেত্রে বাঁশি বাজিয়ে সঙ্গীসাথিদের ডাকা যেতে পারে এবং অপরের সাহায্যে দড়ি দিয়ে চোরাকাদা বা বালি থেকে উঠে আসা যাবে।

ছবি: শেওন আহমাদুজ্জামান

আমার সেই সব পাখি

কেকা অধিকারী

বেশ ছোটো ছিলাম তখন। ক্লাশ ফাইভ বা সিক্সে পড়ি। থাকতাম কলাবাগানে। আমাদের ঘরের একটু পেছনেই ছিল ধানক্ষেত, তারপরেই ছিল একটা লম্বা খাল। এখন যেখানে পান্থপথের রাস্তাটি চলে গেছে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স থেকে ধানমন্ডির দিকে, ঠিক সেখানে। আমাদের সেই ঘরের সামনে ছিল বেশ খানিকটা জায়গা। আমার মা সেখানে ফুলের গাছ আর কিছু সবজি লাগাতেন।

সেই ঘরের পেছনে ছিল আমার রুম। তার জানালার পাশে ছিল আমার পড়ার টেবিল। জানালা দিয়ে সোজা তাকালেই চোখে পড়ত ধানক্ষেত। তারপরেই সেই খাল। জানালার এক পাশে তাকালে দেখা যেত বাঁশ গাছের ঝাড়। পড়া ভুলে আমি প্রায়ই সেই ধানক্ষেতের দিকে, বাঁশ ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কোনো সময় সে ক্ষেতে থাকত ধানের কচি চারা, তার নিচে কাঁদা মাটি আবার কখনো বা পাকা ধান। কিন্তু ধানের ক্ষেতে, বাঁশের ঝাড়ে, বেল গাছটাতে থাকত নানান ধরনের পাখি। সব পাখি কি আর আমি চিনতাম তখন! তবু যাদের চিনতাম তারা হলো চড়ুই, টুনটুনি, লেজ নাচুনে, বুলবুলি, দোয়েল, শালিক, কাক, দাঁড়কাকসহ, আরো কয়েক প্রজাতির পাখি। খালের পানিতে মরা গরু ভেসে এলে শকুনও দেখেছি মনে হয় কয়েক বার। মনে আছে বেল গাছটিতে কচাৎ কখনো হলুদ আর কালো মিশেলের হলদে বউ কিংবা খুব ছোটো কালো চকচকে নীল টুনিরও দেখা মিলত। যেদিন হলুদ পাখির দেখা পেতাম আমার যে কী ভালো লাগত! ভাত শালিকগুলোও ভালো লাগত আমার। ওদের চোখের হলুদ কিংবা কমলা রঙের কাজল কী যে ভীষণ আকর্ষণীয়! অবাক হয়ে ভাবতাম, 'পাখি এত সুন্দর!'

কলাবাগানের বাসা ছেড়ে আমরা এক সময় মিরপুরে চলে আসি। এখানেও আমাদের বিল্ডিংয়ের পাশে ছিল বিরাট বাঁশ ঝাড়। একদিন সন্ধ্যায় রান্নাঘরে গিয়ে দেখি জানালার ওপাশেই একটা পাখি ঘরের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। আমার থেকে হাত তিনেক দূরে হবে। প্রথমে ভয় পেলেও পরে নিজেকে শান্ত রেখে মন দিয়ে লক্ষ্মী প্যাঁচাটিকে দেখেছিলাম। শহরবাসীর জীবনে এমন সুযোগ আর ক'বার আসে? কী অদ্ভুত প্যাঁচার মুখের গঠন, বানরের মুখের সাথে কোথায় যেন মিল আছে!

আমাদের সেই বাঁশ ঝাড়ে ছিল হাজার পাখির আশ্রয়। কিছু পাখি ওখানে বাসাও করত। বেশিরভাগ পাখিই ছিল চড়ুই। ভোরে আর সন্ধ্যায় তাদের কিচির মিচিরকে 'পাখির কলকাকলি' বলার উপায় থাকত না, তা ছিল রীতিমতো প্রচণ্ড রকম শব্দ। এই সময়ে সেই প্রচণ্ড শব্দের জন্যে ঘরে কথা বললে একজনের কথা আরেকজন ঠিকমতো শুনতে পেত না। ডাকতে ডাকতে একটা সময় পাখিগুলো নীরব হতো। ভয়ানক আওয়াজ থেকে শুনশান নীরবতার সেই সময় পর্যন্ত আসতে শব্দের যে বৈচিত্র্য উপভোগ করতাম তা আবারো উপভোগ করতে চাইলে আজ যে কোথায় যেতে হবে আমার জানা নেই। ঢাকা শহরের কোথাও কী আর সে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ আছে?

পরে জেনেছি ও দেখেছি – শত শত চড়ুই সন্ধ্যার সময় কোনো ঝাঁকড়া গাছ অথবা অন্য কোনো গাছে একত্রিত হয়ে মহা শোরগোল করে। তারপরে চুপ। এটাই হলো ওদের রাতের আস্তানা, যাকে বলা যায় 'চড়ুইবাড়ি'।

হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় শহরের গাছ, ফুল ও পাখি। আমাদের সেসব পাখির কথা ভাবলে এখন হৃদয় বিচলিত হয়। একটাই প্রশ্ন অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়, 'নেই কেন সেই পাখি, নেই কেন?'

মো. সিনদিদ হোসেন, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল, মালিবাগ, ঢাকা

ছবি: ক্যাপ্টেন কাওসার মোস্তফা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়

পাখি সংরক্ষণ

ক্যাপ্টেন কাওসার মোস্তফা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পাখি সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশে পাখি সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনা ও জনগণের অংশগ্রহণ তাই অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে শিশু-কিশোর, ছাত্র-শিক্ষক ও যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া আমরা সফল হতে পারব না।

ছোট্ট বন্ধুরা, পাখি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে যদি নিচের বিষয়গুলো কষ্ট করে মনে রাখো।

পাখির গুরুত্ব খাদ্যশৃংখল (Food Chain) রক্ষায় অত্যন্ত জরুরি। কারণ, পাখির খাদ্যের এটি বড়ো অংশ হলো নানা ধরনের কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় (Insects)। পাখি ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে ফল-ফসল ও গাছপালা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

শুধু কীটপতঙ্গ নয় ইঁদুরজাতীয় অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণীও পাখির খাদ্যশৃঙ্খলের অর্ন্তভুক্ত যা ফসলের ক্ষতির অন্যতম কারণ। আর পাখি এসব কীটপতঙ্গ ও প্রাণী দমনের মাধ্যমে ফসল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকেই হয় তো বা বলেন পাখি ফসল খেয়ে প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি করে। প্রকৃতপক্ষে ফসল রক্ষায় ও উৎপাদন বাড়াতে পাখির উপকারী ভূমিকা ক্ষতিকর ভূমিকার চেয়ে অনেক বেশি। একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে এ ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে আশা করি।

> একবার চীন সরকারের ধারণা হলো যে অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও ইঁদুরের সাথে পাখিও ফসল খেয়ে প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি করে। তাই খাদ্যশস্য রক্ষার নামে ১৯৫৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চীন সরকার প্রচুর পাখি (বিশেষত চড়ুই) নিধন করল।
>
> কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো। এতগুলো পাখি নিধনের ফলে পরবর্তীতে দেখা গেল যে, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের উপদ্রব এতটাই বেড়ে গেল যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক কমে গেল।

বলা হয়ে থাকে ঐ সময় চড়ুই নিধনের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে খাদ্যশস্যের অভাবে প্রায় বিশ মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ফলে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে পাখির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফুলের পরাগায়ন ও গাছের বংশবিস্তারেও পাখির অবদান রয়েছে। জানামতে, পুরো পৃথিবীতে ৯০০-এর বেশি প্রজাতির পাখি ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে। শুধু পরাগায়ণ নয় অনেক গাছের বংশবৃদ্ধির জন্যও পাখি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ ঐসব গাছের ফল খেয়ে তার বীজ ওদের মলের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দেয় এবং এভাবেই নতুন গাছের জন্ম হয়।

পাখি আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করে, যা সুস্থ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে, কাক, চিল শকুন ও অন্যান্য পাখি বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ ও মৃত প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। এতে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর ময়লা আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ, মৃত প্রাণী পরিষ্কার করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিরাট অবদান রাখে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে এগুলোর মূল্যমান খুব বড়ো মনে হয় না কিন্তু এর পরিমাণ ও অর্থনৈতিক মূল্য কত ব্যাপক তা নিচের উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

বিভিন্ন কারণে শকুন আজ বিলুপ্তির দোরগোড়ায়। শকুন সাধারণত মৃত প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। কিন্তু বর্তমানে এদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় এসব মৃত প্রাণী প্রধানত কুকুর ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী খাচ্ছে। আর এতে কুকুরের অনিয়ন্ত্রিত বংশবিস্তার ঘটছে। আর কুকুরের কামড়ে নানা রোগ ছড়াচ্ছে। কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ ছড়িয়ে মানুষও মারা যাচ্ছে অনেক। এতে প্রাণ এবং অর্থ দু'ভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

পাখি আবহাওয়া পূর্বাভাসেও সাহায্য করে। ২০১৪ সালে একদল গবেষক দেখতে পান Golden winged Weber নামের একটি পাখির দল আমেরিকার টেনেসি অঙ্গরাজ্য থেকে পরিযায়ন করে ফ্লেরিডা, এমনকি কিউবা পর্বত পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে আবিষ্কার করেন যে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই টেনেসি থেকে পাখিগুলো চলে গিয়েছিল। আর এ সময় ৮৪টি টর্নেডোতে প্রচুর সম্পদ ও অন্তত ৩৫জন লোকের প্রাণহানি হয়। কাজেই বিজ্ঞানিরা যদি সঠিক সময়ে পাখিদের পরিযায়নের কারণ নির্ণয় করতে পারতেন তাহলে বৈরী আবাহাওয়া হাত থেকে সম্পদ রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারতেন। এতে করে পরোক্ষভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করতে পারতেন। এরকম বহু উদাহরণ আছে যা থেকে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখি অবদান বোঝা যায়।

'বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই
কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই;
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে'।
বাবুই হাসিয়া কহে- সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়;
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা,
নিজে হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।'

-রজনীকান্ত সেন

এখানে নবারুণ পাওয়া যায়

পাঠক সমাবেশ

জাতীয় জাদুঘর (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৮৪১২৩৪৬১২

পাখি বান্ধব আইন

পাখি বান্ধব বাংলাদেশ

সাদ মাহমুদ

পাখি ছাড়া প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য থাকে না। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই পাখিরাই পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যদি কোনো কারণে এই পাখিরা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বন। কেননা, পাখিরা ফল খেয়ে বীজ ছিটিয়ে দেয়। গড়ে ওঠে বন। পাখি না থাকলে বন গড়ে উঠবে কীভাবে?

আর তাই, পাখিকে থাকতেই হবে আমাদের সাথে। বাংলাদেশ সরকারও খুব আন্তরিক এ ব্যাপারে। সরকারিভাবে অনেক গঠনশীল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাখি সংরক্ষণের জন্য। ইতোমধ্যে সারাদেশে বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রায় ৭,৫০০টি পাখি উদ্ধার করে প্রকৃতিকে অবমুক্ত করা হয়েছিল।

পাখিসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আমাদের আছে **বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২**। এই আইনের ১নং ও ২নং তফশিলে ৬৫০ প্রজাতির পাখি সংরক্ষিত পাখি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিযায়ী পাখি শিকার ও হত্যার জন্য সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে।

ইতোমধ্যে সারা দেশে পাখি ব্যবসায়ীদেরকে বন্যপাখি ধরা বা বিক্রয় না করার জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতন করা হয়েছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার জন্য সারাদেশে সভাসমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার'।

বিরল প্রজাতির শকুনের মরণঘাতী ওষুধ ডাইক্লোফেনাক উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জাতীয়ভাবে শকুন দিবস পালন করা হচ্ছে।

সারাদেশে ৪টি অঞ্চলে উদ্ধারকৃত ও আহত পাখিকে সেবাদান করার জন্য বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

পাখিসমৃদ্ধ এলাকাকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশগতভাবে বিশেষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আমাদের প্রাকৃতিক বনভূমির যথাযথ সংরক্ষণ করা গেলে বনের উপর নির্ভরশীল সকল প্রজাতির পাখিদের নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করতে পারব। সেই সাথে সাধারণ মানুষের সচেতন আচরণ আমাদের সাহায্য করবে পাখিদের বাসস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। ইতিমধ্যে সারাদেশে বন্য পাখি শিকারিদের বিরুদ্ধে বেশ ভালো জনমত তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের সাধারণ জনগণ এগিয়ে আসছে পাখি শিকারিদের বিরুদ্ধে। শিকারিদের হাত থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে অনেক বিপন্ন প্রজাতির পাখি। পরবর্তীতে সুচিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের বিচরণ ক্ষেত্রে। কাজেই এদেশের পাখিদের সংরক্ষণ বিষয়ে এখন থেকেই তোমাদের জ্ঞানার্জন করতে হবে ও পাখি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে হবে।

কমিক্স

বনের পাখি বনে থাক, খাঁচায় বন্দি করো না

লেখা ও আঁকা: সব্যসাচী চাকমা

শোন। তোরা এমন করিস না। পাখিদের খাঁচায় বন্দি করা উচিত না। বনের পাখি বনেই সুন্দর।
তোর সাহস তো কম না? আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস?
আমি ওটাকে পালবই। সাহস থাকে তো আটকা।
ঢিল ছুড়ে ওটাকে গাছ থেকে নামানো যায়।

আরে! তোরা ওই একটা ছানা নিয়ে কী করবি? ওই বড়ো গাছটায় দেখ। কত পাখি! ইচ্ছামতো পালতে পারবি।
মিথ্যা বলছে না তো?
মনে হয় না। চল দেখি।
গাধাটা মিথ্যা বলেনি। সত্যিই অনেক পাখি!
ওরা খেয়াল করল না, গাছে একটা ভিমরুলের চাক ছিল। ঢিল গিয়ে লাগল-চাকে
ওরে বাবারে! মেরে ফেলল রে!
পাখিদের স্থান খাঁচায় নয়, মুক্ত আকাশে।

এই গপ্‌পের ছবিতে রং নেই। তুমি রং দেবে তো, তাই।

হাঁস ছানা

লিখেছেন নতুন পড়ুয়া
মো. রায়ান কামাল

পুকুরের পানিতে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক প্যাক করছে। মা হাঁসটা পানিতে ডুব দিয়ে মাছ খুঁজছিল। কিন্তু সে মাছ পেল না। তাই মা'র মনটা খুব খারাপ। সেটা দেখে ছানারা মাকে সাহায্য করল। তা দেখে মা খুশি হলো। মা বুঝল যে, মা'র জন্য তাদের খুব ভালোবাসা।

প্রথম শ্রেণি, লিটল জুয়েলস নার্সারি ইনফ্যান্ট অ্যান্ড জুনিয়র স্কুল, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

নবারুণ-এর গ্রাহক কুপন

এই অংশটুকু কেটে ডাকে পাঠাতে হবে অপর পৃষ্ঠার ঠিকানায়

গ্রাহকের নাম .....

ঠিকানা ..... ফোন: .....

৬ মাস	১২ মাস	প্রতি কপির মূল্য	মোট মূল্য
		২০/-	

গ্রাহকের স্বাক্ষর

ছোটোদের গল্প

চিৎকার!

চান্দ্রেয়ী পাল মম

অন্ধকার রাত। মারুফ হোসেন তার মোটরসাইকেল করে বাড়ি ফিরছেন। তিনি একজন পুলিশ অফিসার। আজ ডিউটির কারণে ফিরতে ফিরতে তার প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বেজেছে। হঠাৎ কি যেন হলো মোটর সাইকেল কেমন একটা শব্দ করে চলা বন্ধ করে দিলো। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর মোটরসাইকেলটা স্টার্ট হলো। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন একটি চিৎকার। আরেকবার চিৎকার হতেই তিনি বুঝতে পারলেন সামনের একটি বাসা থেকে চিৎকারটা ভেসে আসছে। তার পুলিশ মন বিপদের আভাস পেলো। মারুফ একটা বিষয় খেয়াল করলেন একটি বাসার দ্বিতীয় তলা থেকেই মনে হচ্ছে আওয়াজটা আসছে। তখন তিনি সেই বাসার গেটে নক করলেন। কিছুক্ষণ পর দারোয়ান গেট খুললো।

-জ্বি আপনি কে? এত রাতে.....

-আমি থানা থেকে এসেছি। দ্বিতীয় তলায় মনে হচ্ছে কোনো বিপদ হয়েছে। তাই সেটা দেখতে চাচ্ছি।

দারোয়ান ঘুমের ঘোরে কিছু না বুঝেই মারুফকে যেতে দিলো।

দোতালায় অনেকক্ষণ নক করার পর একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। মনে হচ্ছে বাসার কাজের মেয়ে।

-কে?

-আমি থানা থেকে এসেছি।

-কি চান?

-মনে হচ্ছে তোমাদের বাসা থেকে কেউ চিৎকার করছে। কেউ কি বিপদে পড়েছে?

-না তো, কেউ তো বিপদে পড়ে নাই!

মেয়েটি দরজা খুলে দিলো।

- খাড়ান, ভাই আর আপারে ডাইকা আনি। এই বলে মেয়েটি ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর এক দম্পতি বের হয়ে এলেন। মারুফ হোসেন তখন বললেন, আমি একজন পুলিশ অফিসার। আপনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো একটি নারী কণ্ঠের চিৎকার শুনলাম। তাই আমি জানতে এসেছি যে কোনো সমস্যা কিনা।

-ও আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের বাসায় তো কোনো সমস্যা হয়নি!!!!

ঠিক তখনই চিৎকারটা আবার হলো। মারুফ বলে উঠলেন-

-এই যে চিৎকার। আপনাদের বাসায়ইতো!

লোকটি হেসে উঠলেন।

-আমি দুঃখিত। এটা আসলে আমাদের পোষা একটি পাখি!!

-কি?? প্রচণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মারুফ।

-হ্যাঁ। এই বলে লোকটি বাসার ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফিরে আসলেন খাঁচায় একটি খুব সুন্দর তোতা পাখি নিয়ে। নীল আর কমলা রঙের মিশেল ম্যাকাও পাখি। এটার ডাক আসলেই একটু চিৎকারের মতো শোনায়।

তখনই পাখিটি ডেকে উঠলো। পুরো মেয়ে কণ্ঠের চিৎকার।

মারুফ হোসেন তো এখনো বিশ্বাসই করতে পারছেন না!

ঠিকানা

বিক্রয় ও বিতরণ শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

চার চিলের নতুন বাড়ি

আহমেদ রিয়াজ

সেই সকাল থেকে বকবক করেই যাচ্ছে মা শঙ্খচিল। 'বাসাটার কী হাল হয়েছে দেখেছ? একটা নতুন বাসা বানানো দরকার।'

খাবার আনতে কেবল তৈরি হচ্ছিল বাবা শঙ্খচিল। কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেল। যা দিনকাল পড়েছে! খাবার খুঁজতেই দিন পেরিয়ে যায়। আগের মতো খাবার মেলে না। তার ওপর নতুন একটা বাসা বানাতে হবে। সময় কোথায়?

মা শঙ্খচিল বলল, 'আমার কথা কী শুনতে পেয়েছ?'

'শুনেছি।'

'তাহলে কিছু বলছ না কেন?'

'কী বলব?'

'এক বাসায় আর কতদিন? অনেক দিন তো হলো। ঝড়তুফানের দিন শুরু হয়ে যাচ্ছে। এবারের ঝড়ে এ বাসা টেকে কি না ঠিক নেই। একটা নতুন বাসা দরকার। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী! নতুন বাসা হবে।'

'কবে হবে?'

'সকাল সকাল না বেরোলে কিছুই পাওয়া যাবে না। আগে খাবার এনে নিই। তারপর না হয়...'

কথাটা শেষ করল না বাবা শঙ্খচিল। তার আগেই ডানা মেলে দিল। বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। ছোট্ট জলাশয় পেরিয়ে চলে গেল আরেকটু সামনে। ওখানে একটা বড়োসড়ো জলাশয় আছে। ওখানেই খাবার মিলতে পারে।

খাবার খুঁজতেই দিন পেরিয়ে গেল। গরমটাও পড়েছে হঠাৎ করে। গরম আর পরিশ্রমে বেশ কাহিল বাবা শঙ্খচিল। নতুন বাসা বানানোর আর সুযোগ পেল না। তাছাড়া বললেই তো আর নতুন বাসা বানানো যায় না। নতুন বাসার জন্য নতুন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। গাছের উপরের দিকে বাসা বানাতে হবে। তিন-চারটা ডাল যেখানে মিলেছে, সেখানে বাসা বানাতে হয়। জায়গাটাও এমন হওয়া চাই, ঝড়ে গাছ নড়লেও বাসায় খুব একটা ঝাঁকুনি লাগবে না। বাবা শঙ্খচিল ভাবল, কাল সকালেই নতুন বাসার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। খাবার আনতে যাওয়ার আগেই।

কিন্তু সে রাতেই উঠল ঝড়। আর ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল চিলদের বাসা।

সারারাত ছানা দুটোকে ডানার তলায় আগলে রেখেছে মা চিল। আর বাবা চিল!

বাবা চিল বসেছিল একটু দূরে। মা চিলের ঠোঁটের নাগালের বাইরে। কখন যে মা চিল ঠোকর মারে, ঠিক নেই। ছানাদের বেলায় কাউকে একটুও ছাড় দেয় না মা চিল।

পরদিন সকালে মা চিল সাফ জানিয়ে দিল, 'আজ নতুন একটা বাসা চাই।'

বাবা চিলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। বলল, 'একদিনের মধ্যে নতুন বাসা বানানো কী সম্ভব?'

মা চিলের এক কথা, আমি আজই নতুন বাসায় উঠতে চাই। সন্ধ্যার মধ্যে। আজ রাতেই নতুন বাসায় ঘুমাবো।'

এখন উপায়? বাবা চিলের কপালে আরো কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। ভাঁজগুলো চিন্তার। হঠাৎ একটা বুদ্ধি

পেয়ে গেল বাবা শঙ্খচিল।

টি-এঁ-এঁ-এঁ টি-এঁ-এঁ-এঁ শব্দে হাঁক দিল কয়েক বার। আর অমনি জড়ো হয়ে গেল পাড়ার আরো তিনটা বাবা শঙ্খচিল। চার বাবা শঙ্খচিল মিলে হামলা চালাল। কোথায়?

পাশের গাছে। পাশেই বিশাল এক ইউক্যালিপটাস গাছ। বেশ মোটাসোটা। এ তল্লাটের সবচেয়ে উঁচু গাছ। ওখানে বাসা বানিয়েছে ভুবনচিল। বাসাটাও শক্তপোক্ত আর বড়োসড়ো। অনেক দিন ধরেই ভুবন চিলদের বাসাটার দিকে বদ নজর ছিল শঙ্খচিলদের। আজ দখল করতেই হবে।

আকারে ভুবনচিল বেশ বড়। তাতে কি! শঙ্খচিলদের সঙ্গে লড়াই করে টিকতে পারেনি দুই ভুবনচিল। দুতিনবার হামলা চালাতেই বাসা ছেড়ে দিল ওরা।

ভুবনদের বাসা! মা শঙ্খচিল তো আরো খুশি। ওদের বাসাটা অনেক উঁচুতে। যাক, তল্লাটের সবচেয়ে উঁচু বাসায় থাকতে পারবে ওরা। আজ থেকেই!

তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভুবনচিলের বাসায় এসে উঠল শঙ্খচিলেরা।

কিন্তু এ কী! বাসাটার এ রকম হাল কেন? একেবারে বিচ্ছিরি! ছিন্নভিন্ন। এজন্যই তো বলি, চটজলদি কেন ওরা বাসা ছেড়ে দিল? কী শয়তান!

মা শঙ্খচিল বলল, 'যেমনই হোক, এ বাসাতেই থাকব আমরা। দরকার হলে বাসা মেরামত করিয়ে নেব।'

আবার ঘাবড়ে গেল বাবা শঙ্খচিল। খাবার জোগাড় করতে যাবে, নাকি বাসা মেরামত করবে। আগের বাসাটাই তো ভালো ছিল। ভুবনচিলদের বাসার মতো এত ছিন্নভিন্ন অবস্থা ছিল না। তাছাড়া ভুবনচিলদের সঙ্গে লড়াই করে বেশ ক্লান্ত সে। এখন দরকার খাবার।

আর ঠিক তখনই এল ওরা। ওদের বাসার নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। আর হাঁক দিচ্ছিল-বাড়ি ঠিক করাবেন নাকি গো! বাড়ি!

চটপট লাফিয়ে উঠল মা শঙ্খচিল। বলল, 'আরে! আমাদের বাড়িটা তো ঠিক করানো দরকার। ডাকো ওদের।'

আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিল বাবা শঙ্খচিল, 'আমার বাড়িটা মেরামত করে দিয়ে যাও।'

যাক। এতক্ষণে একটা কাজ পাওয়া গেল। সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক বাবুই আর এক টুনটুনি। এ গাছ থেকে ও গাছ। এ পাড়া থেকে ও পাড়া। কিন্তু কাজ পায়নি। চটপট কাজে লেগে গেল দুজন।

বাসা তৈরির কারিগর হিসেবে বাবুইয়ের বেশ সুনাম। সহকারী হিসেবে নিয়েছে টুনটুনিকে। টুনটুনিও ভালো বাসা বানায়। দুজন মিললে তো দারুণ হবেই।

শঙ্খচিলের বাসা মেরামতের কাজে নেমে গেল ওরা।

পুরো সকাল ওরা কাজ করল। পুরো দুপুর ওরা কাজ করল। বিকেলের ঠিক আগে আগে শেষ হলো কাজ।

কাজ শেষ। শঙ্খচিলদের ডেকে দেখালো বাবুই। কিন্তু এ কী! নিজেদের বাসাটাই চিনতে পারল না শঙ্খচিলেরা। এটা কোনো বাসা হলো?

বাবুই বলল, 'আমার নিজের বাসার চেয়েও সুন্দর বাসা বানিয়ে দিয়েছি। বলতে গেলে একেবারে নতুন একটা বাসা হয়েছে।'

টুনটুনি বলল, 'আমার বাসাটাও এত সুন্দর নয়। দেখ সেলাইগুলো যা হয়েছে!'

সেলাই! চমকে উঠল বাবা শঙ্খচিল। চেঁচিয়ে উঠল, 'বাসা কি জামাকাপড় পেয়েছ? নাকি বিছানার চাদর যে সেলাই করতে হবে?'

মিনমিন করে টুনটুনি বলল, 'আমাদের বাসা তো আমরা সেলাই করেই...'

বাকিটা আর বলতে পারল না ওরা। ডালে বসে থাকা মা শঙ্খচিল তেড়ে এল। বলল, 'দেখাচ্ছি তোমাদের বাসা মেরামতি। চিলদের বাসা সম্পর্কে জানো কিছু?'

আর কিছু জানতে চায় না বাবুই আর টুনটুনি। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ওরা। সুড়ুৎ করে ওই তল্লাট থেকে পালালো ওরা।

কী আর করা। আবার সেই পুরনো বাসায় ফিরে গেল শঙ্খচিল পরিবার।

পরদিন।

বাসা বানানোর সুন্দর একটা জায়গা খুঁজে পেল বাবা শঙ্খচিল। ব্যাস, চার চিল মিলে নতুন বাসা বানাতে শুরু করল। চার চিল মানে বাবা শঙ্খচিল, মা শঙ্খচিল আর তাদের দুই ছানা। ওদের নতুন বাসাটা ভুবনচিলদের বাসার চেয়েও উপরে।

বোকা কাক

অপু চৌধুরী

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, কাক পাখিটাই বোকা,
কা কা করে ডাক দেয় শুধু সবখানে খায় ধোঁকা!
কর্কশ স্বরে ডাক দেয় বলে সবাই মন্দ কয়,
প্রশংসা করে শিয়াল মামা সে সুযোগটা লয়।
কাক পাখিটা কষ্ট করে টুকরা মাংস নিল কেড়ে,
খুশিতে সে শাখায় বসে খাচ্ছে মাংস তেড়ে নেড়ে।
নিচ থেকে ঐ শিয়াল মামা কাক পাখিকে কয়,
তোমার কণ্ঠ খুব সুরেলা আছে তাল ও লয়।
খুশি হয়ে বোকা কাক, কা করে এক দিল ডাক,
সাথে সাথে টুকরা মাংস নিচে পরে সর্বনাশ।
চতুর শিয়াল কূ-উ করে, নিল মাংস মুখ পুরে,
কাককে বলে চলিরে ভাই, গান কর্ তুই মন ভরে।

ভাত ছিটালে
নাকি কাকের
অভাব হয় না। এ
কথা কেন
বলা হয়, জানতে
চাই।

কাক ডাক

মিশকাত উজ্জ্বল

কাকের কণ্ঠ কর্কশ অতি
ডাকে শুধু কা কা
কাকের কোলাহল ছাড়া তবু
শহর যেন ফাঁকা!
সারাটি দিন ঘুরে বেড়ায়
উড়ে উড়ে গাছে।
নোংরা পঁচা খাবার খেয়ে
জীবনটা তার বাঁচে।
কাক নাকি চালাক অতি
আসলে সে বোকা।
নইলে কি আর কোকিল তাকে
দেয় সহজে ধোঁকা?

ছড়া

মিলি হক

মায়াটুনি হোগলা টুনি
কোথায় তোর বাস?
হোগলা গাছে বোলতা আছে
তাই বসে তুই খাস।
গোলপাতা আর কেয়া ঝাড়ে
বাসা বেঁধে আয়েশ করে
পায়েস রেঁধে খাবি যখন
বাঘ মহাশয় আসবে তখন
ভাগ বসাবার আগেই তুই
টুনটুনিরে হবি পগার পার।

পাখির মতন

আকরাম সাবিত

এই যে দ্যাখো নদীর তীরে ঠিক এখানে গাছ ছিল
গাছের ডালে এক বিকেলে দুইটি পাখি নাচ্ছিল
নাচতে গিয়ে মনের সুখে ভাটির গীতি গাচ্ছিল
ঠিক তখন-ই নদীর জলে নৌকা ভেসে যাচ্ছিল
হালিম মাঝি বৈঠা রেখে পাখির নাচ দেখছিল
নায়ের পাশে জলের ওপর অনেকগুলো মাছ ছিল
বোয়াল তাতে এক দুটি নয় একেবারে পাঁচ ছিল
বোয়ালগুলোর চলায় যেন ছন্দ ছড়ার ধাঁচ ছিল
এসব দেখে সেই পাখিরা ভীষণ মজা পাচ্ছিল
পাখির মতন ওড়তে তখন এই হৃদয়ে চাচ্ছিল

ও পাখি ভাই

ওয়াহিদ জামান

ও পাখি ভাই, ও পাখি ভাই
উড়তে আমি চাই,
যদিও পাখা নাই,
তবুও কি সঙ্গে নেবে
আমায় তুমি ভাই?

তোমার সাথে উড়াল দেবো
যাব অনেক দূরে,
গাইব সুরে সুরে,
বাঁধব বাসা থাকবো সুখে
সুদূর অচিন পুরে।

বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে
ফলফলাদি খাব,
সবুজ মাঠে যাব,
খুব সকালে কিচিরমিচির
প্রভাতি গান গাবো।

ও পাখি ভাই দোহাই তোমার
আমার দিকে চাও,
সঙ্গে করে নাও,
পাশাপাশি নিয়ে চলো
যেথায় তুমি যাও।

হরেক নামের পাখি

মো. মনিরুজ্জামান মনির

ময়না-টিয়ে কথা বলে
কোকিল কুহু স্বরে
ছোটো ছোটো পাখিগুলো
কিচিরমিচির করে।

শালিক, ঘুঘু গাছের ডালে
চড়ুই ঘরের কোণে
বাবুই পাখি তালের পাতায়
নিজের বাসা বোনে।

দোয়েল, শ্যামা, পেঁচা, তোতা।
হরেক নামের পাখি
মাতৃভাষায় আপন মনে
করছে ডাকাডকি।

পাখির কথা

ইউনুস আহমেদ

কিচিমিচি শোনা যায় শালিকের ঝাঁকে
টুনটুনি দেয় উঁকি পাতার ফাঁকে।
টিয়ে পাখি উড়ে যায় নীল আকাশে
ছড়িয়ে ডানা চিল বাতাসে ভাসে।

কুম কুম ডেকে যায় বুনো কবুতর
ভুতুম- সেতো এক পাখি নিশাচর।
সাদা বক খোঁজে মাছ বিলের জলে
উঠোনে চড়ুই দল মাতে কোলাহলে।

নিঝুম দুপরে ডাকে পিউ পাপিয়া
চাতক কাতর হয় জল চাহিয়া।
সাঁঝবেলা পাখি ফেরে আপন নীড়ে
মন আমার ছুটে যায় অচিনপুরে।

সকাল হলেই

মো. আহনাফ সিদ্দিক

সকাল হলেই পাখিরা সব,
মধুর সুরে ডাকে।
শালিক পাখির দলগুলো যে,
উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।
গাছের ডালে আছে বসে
দোয়েল, ময়না, টিয়ে,
যাচ্ছে খোকা যাচ্ছে খুকি
টোপর মাথায় দিয়ে।
খোকার হাতে উপহার,
খুকির কানে দুল।
কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, গোলাপ,
লাল রঙের ফুল।
চড়ুই পাখি, টুনটুনিরা,
মনের সুখে গায়।
কোকিল পাখির গানের সুরে
মনটা ভরে যায়।

৩য় শ্রেণি, গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলাচিপা , পটুয়াখালি।

সকালবেলার সেই পাখিটি

মো. রাশেদুল ইসলাম (সাগর)

সকাল বেলার সেই পাখিটি
ব্যস্ত ডানায় দোটানা
ফুল ফুটাতে ফুলের বনে
আর তো জেগে ওঠে না।
দুঃখ ভুলে রঙিন ফুলে
প্রজাপতি দোলে না ,
বন হয়ে যায় বিরান ভূমি
পাখির স্মৃতি ভোলে না।

নবম শ্রেণি, তাজ আইডিয়াল স্কুল, জুরাইন , ঢাকা।

টুনটুনি

সাদ সাইফ

লাউয়ের মাচায় বেঁধেছে বাসা
ছোট্ট টুনটুনি পাখি,
সকাল-বিকাল কিচিরমিচিরে
জুড়ায় আমার আঁখি।

পাখির বাসার ভিতরে দেখি
টুনটুনির এক ছা,
খুব যতনে ঘুমিয়ে আছে
পাশে নেই তার মা।

একাদশ শ্রেণি, ডা.আফিল উদ্দীন কলেজ, বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

পাখি

আরাফ হোসেন

তাল গাছে বাবুই পাখি
ঘরের চালে কাক
নারকেল ডালে দুপুরবেলা
ঘুঘু পাখির ডাক

তেল খেয়েছে তেলাপোকা
ধান খেয়েছে কাক
খুকুমনির কান্না থামে
দেখে কবুতরের ঝাঁক

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল, ঢাকা।

গল্প

একটি রাজহাঁস

মাহমুদা সুলতানা

ছন্দময় ভঙ্গিতে রাজহাঁসটি হাঁটছিল। মরাল গ্রীবা উঁচু করে হাঁটছিল কংক্রিটের মেঝেতে। হাঁটছিল আর তাকাচ্ছিল চারদিকে। ভাবছিল, কোথায় এলাম। সঙ্গীসাথিরা নেই, গাছগাছালির মায়াময় স্পর্শ নেই। ওর মনে হচ্ছিল, বড়ো কঠিন আর নির্মম জগতে এসে পড়েছে। রাজহাঁসটির আজ ভারি মন খারাপ।

হঠাৎ করে ওখানে এল বিন্নি, বিন্তি আর বিন্দি। একরাশ খুশি ছড়িয়ে ওরা বলল, দাদু রাজহাঁস আমরা কিন্তু পুষব। অনেক আদর করব আর খাওয়াব। ওর কোনো কষ্ট হবে না। অবাক বিস্ময়ে শিশুদের দেখছিল রাজহাঁস। মাঝে মাঝে হাঁটছিল তবে গর্বিত ভঙ্গিতে নয়, ওর হাঁটার মধ্যে ছিল কান্নার মতো করুণ এক আর্তি। বিন্নি, বিন্তি আর বিন্দির কথা শুনে মনে হলো পৃথিবীটা এখনো অতো নিষ্ঠুর হয়নি। শিশু তিনটির মুখশ্রী কিছুটা আনন্দিত করেছিল ওকে। ওদের নিষ্পাপ চাহনি বড়ো ভালো লাগছিল ওর। ওরা যখন এসে রাজহাঁসটির গায়ে হাত রাখল তখন মনে হলো বড়ো আপনজনের মতো এই স্পর্শ।

বিন্নি, বিন্তি, বিন্দি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদু তুমি কিন্তু ওকে দেখে রেখ। কেউ যেন নিয়ে না যায়। দুপুর হয়েছে। বিন্নিরা রাজহাঁসটিকে খাবার এনে দিলো।

বেশ খানিকটা ভাত। তারপর বলল, আমরা খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব। তুমি এখানে থেকো।

ভাত খাওয়ার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না রাজহাঁসের। ও ভাবছিল গ্রামের কথা। বড়োই মায়াময় সেই গ্রাম। অজস্র পাখির কলতান; নিবিড় ভালো লাগার মায়াময় পরিবেশ রাজহাঁসটিকে ব্যথিত করে তুলছিল। সেই গ্রামের পুকুরের নিস্তরঙ্গ জল ওকে টানছিল। বড়ো বেশি টানছিল। পুকুরে সাঁতার কাটার সেই অপরূপ দৃশ্য মনে পড়ছিল। আহা কী শান্তি! এখানে শান্তি নেই, সব আনন্দ নির্বাসিত।

বিন্নিদের কথা ভাবছিল। চারদিকে তাকালো রাজহাঁসটি। কোথাও ওরা নেই। এমন সময় কয়েকজন মানুষ এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তখনো সেই গ্রামের জলের স্পর্শ ওকে টানছিল। সেই স্পর্শ সারা শরীরে মেখে রাজহাঁসটি নির্বাক হয়ে গেল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো মানুষের দিকে। হাতে চাকু। মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন? পৃথিবীকে শেষ বারের মতো দেখার আগে বিন্নিদের কথা মনে হলো। ও দেখতে পেল তিন জোড়া সজল চোখের করুণ মায়াময় চাহনি।

সেই দৃশ্য সহ্য করা বড়ো কষ্টকর। সমস্ত শরীরে আমার বিষণ্নতা। আমি নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। কী দেখছিলাম মনে নেই। আশ্চর্য এক নিষ্ঠুর দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

বিন্নিরা এল। অঝোরে কাঁদছিল ওরা। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদু তুমি রাজহাঁসটিকে ধরে রাখতে পারলে না।

ওদের সজল চোখের ধারা অজস্র ধারায় সিক্ত করল আমাকে। বিন্নি-বিন্তি-বিন্দি বলল, তুমি পচা দাদু।

বিষণ্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমি কি মানুষ? আমার এখানে দোষ ছিল না, তবু নিজেকে মানুষ ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হলো পৃথিবীর সবকিছু পচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। এই পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় নেই।

শীতের পরিযায়ী পাখি

এস. এম. ইকবাল

প্রতি বছর উত্তরের শীতপ্রধান দেশ থেকে সাধারণত জুলাইয়ের শেষ দিকে পরিযায়ী পাখি আসতে শুরু করে। তবে শীত মৌসুমে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত বেশির ভাগ পরিযায়ী পাখি বাংলাদেশে আসে। কাশ্মীর, হিমাচল, কিছুটা উত্তর-পূর্বে লাদাখ, সিনকিয়াং ও তিব্বত, দূরবর্তী পূর্ব ইউরোপ, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া, উত্তর-পূর্বের মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া, কিছুটা দক্ষিণে চীন ও উত্তর মিয়ানমার (বার্মা), পশ্চিমের আরব সাগর ও আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশে শীতের পাখি এসে থাকে।

পরিযায়ী পাখিদের যাতায়াতের এই পথকে উড়ালপথ (Flyway) বলে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘন উড়ালপথটি হচ্ছে ইউরোপ ও এশিয়া থেকে সিনাইয়ের ওপর দিয়ে আফ্রিকা যাওয়ার পথ। প্রায় সব ক'টি উৎস থেকে আসা পাখিরা এ পথের উপর দিয়ে গিয়ে আফ্রিকায় ছড়িয়ে যায় এবং ফিরতি পথে এ পথ দিয়েই তাদের স্থায়ী আবাসস্থলে ফিরে যায়। বংশপরম্পরায় এরা এ কাজটি করে আসছে এবং প্রতি বছর হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করলেও একই স্থানে তারা ফিরে আসে।

দীর্ঘ যাত্রায় পাখিরা কীভাবে পথ চেনে সে এক রহস্য। দেখা গেছে পথ চেনাতে অভিজ্ঞ পাখিরাই ঝাঁকের সামনের দিকে থাকে। নতুনরা থাকে পেছনে। এক্ষেত্রে পাখিরা উপকূলরেখা, পাহাড়, নদী, সূর্য, চাঁদ, তারা ইত্যাদির মাধ্যমেই পথ খুঁজে নেয় বলে ধারণা করা হয়। যে-সব পাখি একা ভ্রমণ করে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, জীবনে প্রথমবার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেও তারা গন্তব্যে পৌঁছে যায়। এজন্য বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রই পাখিদের পথ চেনায়।

বাংলাদেশের যে কয়েকটি স্থানে পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো এলাকা হচ্ছে হাকালুকি হাওর। সবচেয়ে বেশি অতিথি পাখি সমাগমের পাশাপাশি বেশি প্রজাতির পাখির দেখা মেলে এখানে। আরেকটি হচ্ছে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বাইক্কা বিল। শীতে নভেম্বরের শেষ থেকেই মৌলভীবাজার জেলার অন্যতম জলাভূমি শ্রীমঙ্গলের এই বাইক্কা বিলে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখিরা ছুটে আসে। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এরা এখানে থাকে।

রাজশাহী জেলার পদ্মার বিভিন্ন চরে ময়াল রাজহাঁস, পাতারি হাঁস, টিকি হাঁস, পান্তামুখি, পিয়ং হাঁস, চখাচখি, লোহারজঙ্গ, কালাজাঙ্গ, মানিকজোড়, খোঁয়াজ, কাস্তেচরাসহ নানা প্রজাতির পাখির সমাগম ঘটে। বগুড়া জেলার ডাকাতমারা চরে দেখা মেলে মানিকজোড়, বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, খঞ্জনসহ বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। এছাড়াও সোনাদিয়া দ্বীপ, দমার চর, নিঝুম দ্বীপ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, পুটিয়ার পচামাড়িয়া, দিনাজপুরের রামসাগর, বরিশালের দুর্গাসাগর এবং নীলফামারি জেলার নীলসাগরেও প্রচুর শীতের পরিযায়ী পাখির বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। বৃহত্তর খুলনা জেলার বেশ কয়েকটি বিল ও হাওরে – বিশেষ করে খুলনার তেরখাদা উপজেলা, রূপসা উপজেলা ও বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট, মোল্লাহাট, চিতলমারি উপজেলা জুড়ে বিশাল 'উত্তরের হাওর'-এ বহু পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ওই হাওরে অতি বিরল পাখি সাদা মানিকজোড়ের (Oriental Stork) দেখা মিলত। বেশ কয়েক প্রজাতির দুর্লভ পাখির দেখা মেলে ওই হাওরে। যদিও ওই হাওর চিংড়ি চাষের জন্য 'বাংলাদেশের কুয়েত' খ্যাতি অর্জন করেছে বহু আগে। তার আগে ছিল পাখি ও মাছের খনি। বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ ক্লাবের হাতে এই হাওরের বিগত বহু বছরের পাখি জরিপের রিপোর্ট বা রেকর্ড আছে।

শীতের পাখি শুমারি

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শুমারি অনুযায়ী, ২০১৩ সালে এদেশে আগত পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার ও ২০১৪ সালে প্রায় ৮৫ হাজার। তিন বছর ধরে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর এলাকায় পাখি আসার সংখ্যা বেড়েছে। তবে ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশে পরিযায়ী পাখির অন্যতম আবাসস্থল ছিল মৌলভীবাজারের বাইক্কার বিল। শুমারি অনুযায়ী, টাঙ্গুয়ার হাওরে বরাবরের মতো পাখির সমাগম সবচেয়ে বেশি, মোট ৫২ হাজার ২৯৯টি। তবে প্রজাতির ভিন্নতা বেশি দেখা গেছে হাকালুকি হাওরে। ৬৮ প্রজাতির ২১ হাজার ৮০১টি পরিযায়ী পাখি আসে হাকালুকিতে। টাঙ্গুয়ার হাওরে দেখা গেছে ৪৩ প্রজাতির। এছাড়া দমার চরে ২১ প্রজাতির ১২ হাজার ২৬৭টি এবং সোনাদিয়া দ্বীপে ৩৭ প্রজাতির ২ হাজার

'মাটি দিয়ে আর জলাভূমি ভরাট নয়। গাছ কেটে বন উজাড় করে আর পাখির আবাসস্থল ধ্বংস নয়। কৃষি জমিতে বিষ প্রয়োগ আর নয়।'

৩২৩টি পাখি গণনা করা হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওর পরিযায়ী পাখির জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্থান। এই জলাশয়টিকে জাতিসংঘের রামসার কর্তৃপক্ষ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে ২০০০ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর থেকে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে। ২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ছিল ১ লাখ। টাঙ্গুয়ার হাওরে এ বছর সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে কালকুট পাখি যার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৬৮৭টি। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মৌলভী হাঁস। সোনাদিয়া দ্বীপে ৯২০টি ছোটো ধুলজিরিয়া ও ২৫০টি বড়ো ধুলজিরিয়া পাখির দেখা মিলেছে। এছাড়াও এখানে বিশ্বব্যাপী সংকটাপন্ন নয়টি চামচ ঠুঁটো বাটানেরও দেখা মিলেছে।

জীব বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ শীতের পরিযায়ী পাখি অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি ফ্রেন্ডশীপ ইস্ট এশিয়ান-অস্ট্রেলিয়ান ফ্লাইওয়ে নামক অতিথি পাখি সংরক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। ফ্রেন্ডশীপ ফর ইস্ট এশিয়ান-অস্ট্রেলিয়ান ফ্লাইওয়ের একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে এ স্বীকৃতিমূলক সনদপত্র হস্তান্তর করে। সংস্থাটির দেওয়া সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশের টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, নিঝুম দ্বীপ ও সোনাদিয়া– এই পাঁচটি এলাকা পরিযায়ী পাখিসমৃদ্ধ অঞ্চল। তাদের মতে, এসব এলাকায় বহু বছর ধরে পরিযায়ী পাখিরা নিরাপদে বাস করছে। অবিলম্বে এসব অঞ্চল সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সৌন্দর্যের আধার এই পরিযায়ী পাখি কি শুধু আমাদের মনের ক্ষুধা মেটায়! পতঙ্গভুক পরিযায়ী পাখি নানা প্রজাতির ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ফসলকে রক্ষা করে। মৎস্যভুক পরিযায়ী পাখি অসুস্থ ও দুর্বল

মাছ খেয়ে অন্যান্য মাছ ও জলজ পরিবেশ ভালো রাখে। ইঁদুরভুক পরিযায়ী পাখি ইঁদুর খেয়ে কৃষকদের উপকার করে। এসব পাখি হাওর-বাওর, বিল-ঝিলে অবস্থান করে বলে এদের বিষ্ঠা মাটিতে জমা হয়ে মাটিকে ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ করে তোলে। এগুলো জৈব সার হিসেবে কাজ করে মাটিকে উর্বর করায় ভালো ফসল উৎপাদন হয়।

লাখ লাখ পরিযায়ী পাখির ঐকতানের দৃশ্য আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের অনেক জলাভূমি ভরাট হয়ে গড়ে উঠছে জনবসতি। বন উজাড় হচ্ছে। নদী দখল ও দূষণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। অধিক পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়িয়ে তুলছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। কৃষিজমিতে অধিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে প্রকৃতি ও জীবন। বায়ুদূষণের মাত্রা সেই বিপন্নতাকে আরো ত্বরান্বিত করছে। তারপর আছে নিষ্ঠুর শিকারির নির্মমতা। আইন থাকতেও পাখি শিকারের এই অপতৎপরতা কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

শীতের এসব পরিযায়ী পাখিদের বৈচিত্র্য বাংলার মাটিতে ধরে রাখতে হলে এসো সবাই মিলে কণ্ঠ মিলাই। মাটি দিয়ে আর জলাভূমি ভরাট নয়। গাছ কেটে বন উজাড় করে আর পাখির আবাসস্থল ধ্বংস নয়। কৃষিজমিতে বিষ প্রয়োগ করে আর নয় পাখির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন করা।

প্রকৃতির অলংকার হিসেবে পরিবেশ ও পর্যটনের জন্য স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল ও জলাভূমি সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবি।

সাধারণভাবে পাখির অভয়াশ্রম বা অভয়ারণ্য বলতে এমন ধরণের বনাঞ্চল বা এলাকাকে বোঝানো হয় যেখানে পাখির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় ও তাদের প্রজনন, খাদ্য সংস্থান ও আবাস নিরাপদ রাখতে শিকারিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অভয়ারণ্য ঘোষণা করার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়–

১. ঐ এলাকার পাখি যেন ধ্বংস না হয়।

২. পাখিদের শান্তি, নিরাপদ বংশবৃদ্ধি, নিরাপদ বিচরণ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কাজ যেন না হয়।

বাংলাদেশের বিদ্যমান বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী কোনো সরকারি বন বা বনের অংশ, সরকারি ভূমি, জলাভূমি বা যে-কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবে সীমানা নির্ধারণ করে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পাখি অভয়ারণ্য বা জলাভূমি নির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়।

শীতে খাঁচার পাখির যত্ন

প্রিয় পাখির শীতের যত্নে সচেতন থাকা চাই কিছু বিষয়ে। জেনে নাও এখনি-

- পাখির খাঁচা এমন জায়গায় রাখুন যাতে সরাসরি ঠান্ডা না লাগে। প্রচণ্ড ঠান্ডার সময়ে বারান্দা অবশ্যই পলিথিন বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- প্রতিদিন পাখির খাঁচা ২ থেকে ৩ ঘন্টা রোদে রেখে দিন। তবে খাঁচার এক পাশে ছায়া করে দিন। যাতে রোদে কষ্ট হলে ছায়ায় দাঁড়াতে পারে।
- রাতের বেলা পাখির খাঁচা অবশ্যই মোটা কম্বল বা কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। একটু ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে, যেন অক্সিজেন প্রবেশ করে।
- পাখিকে মধু, আদার রস, তুলসি পাতার রস এবং ভিনেগার দিয়ে পানি দিতে পারেন। এতে ঠান্ডা লাগা থেকে রক্ষা করবে।
- শীতকালে পাখির খাবারের সঙ্গে তেল জাতীয় বীজ যেমন- সূর্যমূখী বীজ, তিল ইত্যাদি বাড়িয়ে দিতে পারেন। এছাড়াও বাদামি চাল, ক্যানারি, ভুট্টা (হলুদ, লাল, সাদা), নাইজার, চিনা (জই), কাউন, সরিষা, বজরা, মুগ ডাল, ব্রকোলি, মৌরি দিতে পারেন।
- পাখির খাবারের পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করে দিতে হবে। যাতে জীবাণু আক্রমণ না ঘটে।

পাখিদের ঘরে ফেরা

মোকারম হোসেন

পাখির জীবন রহস্য নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। এ কারণে প্রাচীন লোককাহিনি থেকে শুরু করে গান-গীতিকায়ও পাখির বিচিত্র জীবন উঠে এসেছে। মানুষ পাখির মুক্ত জীবনের প্রতি নানাভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। পাখির পেছনে নিরন্তর ছুটতে ছুটতে পাখির জীবন রহস্য অনেকটাই উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছে। একটি পাখি কতদিন বেঁচে থাকতে পারে, ওরা কীভাবে বাসা বানায়, ওদের খাদ্যাভ্যাস, বাসা বানানোর কৌশল, বংশবিস্তার, বিশ্রাম, আত্মরক্ষা বা রাতের আশ্রয় ইত্যাদি বিষয়গুলো এখন মানুষের নখদর্পণে। তবে প্রতিটি পাখির জীবনই নানান বৈচিত্রে ভরপুর। আবার প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু কিছু পাখির মধ্যে পরিবর্তনও ঘটে। প্রজনন মৌসুমে ওদের কণ্ঠ ও পালকের রং বদলে যেতে পারে। বদলায় খাদ্যাভ্যাসও।

অ া স ল ে পাখিদের নীড়ে ফেরার বিষয়টি মানুষের কল্পনার রাজ্যে যতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে বাস্তবে ততটা নয়। যেমন ভর সন্ধ্যেবেলা কিংবা আকাশে যখন রক্তিম আভা ছড়িয়ে সূর্যটা বিদায় নিতে থাকে তখন সকল প্রাণীই একটি নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে চায়। কোনো এক নিভৃত গাঁয়ের ঘনায়মান সন্ধ্যায় পাখিদের ব্যস্ততা বা কোলাহল একজন মানুষের জীবনকে যতটা প্রভাবিত করে ততটাই উপেক্ষিত থাকে নগর জীবনে। যদিও নাগরিক পাখির তেমন কমতি নেই। তবুও গ্রামে ভোর মানে পাখির ডানায় মোড়ানো রাঙা প্রভাত আর সুরেলা কণ্ঠের সুমধুর আহ্বান গীত। কিন্তু গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে পাখিদের ঘরে ফেরার একটি উলটো চিত্রও পাওয়া যায়। শুধু সন্ধ্যায় নয়, রাতের নিশাচর পাখিরা তো আলো আঁধারিতেই ফিরে যেতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ে।

পৃথিবীতে পাখিদের ঘরে ফেরার অনিন্দ্য সুন্দর মুহূর্ত নিয়ে অনেক দুর্লভ সাহিত্য রচিত হয়েছে। সাধারণত গোধূলিলগ্নেই পাখিরা বিচ্ছিন্নভাবে বা দলবদ্ধভাবে রাতযাপনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এই বেরিয়ে পড়া বা ফিরে যাওয়াটা আপাতদৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানাকে বোঝালেও আদতে ওরা প্রতিদিন কোনো একটি নির্দিষ্ট আস্তানায় ফিরে যায় না। খাবার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে ওরা প্রতিনিয়তই অবস্থান বদলায়।

আবার কিছু কিছু পাখি একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যায় না। গেলে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। দিনের আলোয় যে পাখিগুলোকে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের চারপাশে ছুটাছুটি করতে দেখি রাতে তো ওদের এভাবে দেখতে পাই না। তাহলে রাতে ওরা কী করে বা কোথায় থাকে? এ নিয়ে আমরা খুব একটা না ভাবলেও গবেষকরা ঠিকই এসবের অ ন ু স ন্ধ া ন করেছেন। একদল পাখি আছে যারা দিনের আলোয় খুব একটা বেরোয় না। এসব নিশাচর পাখিরা রাতেই খাবারের সন্ধানে বা অন্যান্য প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়ে। রাতে কিন্তু ওরা খুব একটা বিশ্রাম নেয় না। আবার কিছু কিছু পাখি আছে যারা রাতের বিভিন্ন মুহূর্তে ডেকে ওঠে একেকটি ক্ষণ বা সময়ের কথা জানান দেয়। ঢাকায় এমন অনেক পাখি আছে যারা শুধুমাত্র খাবারের সন্ধানে প্রতিদিন ঢাকার নিকটবর্তী এলাকাগুলো থেকে ঢাকা শহরে আসে। সন্ধ্যায় ওরা আবার ফিরে যায়। এর মধ্যে অন্যতম ভুবনচিল। দিনের বেলা এদের ঢাকার সুউচ্চ কোনো গাছে বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। ওদের বেশি প্রিয় হচ্ছে বৃক্ষশোভিত রমনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

তবে নিশ্চিত করে বলা যায় বাংলাদেশের কোনো পাখি রাত যাপনের জন্য বাসা বানায় না। শুধুমাত্র প্রজনন মৌসুমে ওরা বাসা বানায়। বাচ্চা ফোটানোর পর আর সেই বাসার কোনো খোঁজও রাখে না। এক্ষেত্রে ওরা শুধু নিরাপদ অবস্থানের কথাটাই মাথায় রাখে। বেশিরভাগ পাখিই গাছের ডালে ঘন পাতার আচ্ছাদনে রাত কাটিয়ে দেয়। তীব্র শীতের রাতে ওরা সাধারণত বাতাসটা আড়াল করেই বসে। কনকনে বাতাস থেকে বাঁচার জন্য গাছের ডালপালা বা শক্ত কোনো আচ্ছাদন বেছে নেয়। স্বল্প মাত্রার ঝড় বৃষ্টিতেও ওরা গাছের ডালেই থাকে। এসময় বাতাসের ঝাপটা সরাসরি যেন না লাগতে পারে সে জন্য গাছের কাণ্ড বা মোটা ধরনের ডালপালার আড়ালেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড ঝড়ে বা একই সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি বা শিলাপাত হলে পাখিদের দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। তখন পা দিয়ে ডালপালা আঁকড়ে রাখতে পারে না, অথবা আঁকড়ে ধরা ডালপালা সমেতই উড়ে যায়। আবার ডালপালার আঘাতেও আহত হতে পারে পাখিরা। ঝড়ের দাপটে ছিটকে যাওয়া পাখি অন্য গাছের ডালপালায় গিয়ে আছড়ে পড়ে, তখন তার আত্মরক্ষার অবলম্বন হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে সবক্ষেত্রেই ওরা শত্রুর আক্রমণের কথাটা মাথায় রাখে। ঢাকায় অনেক স্থানেই পাখিদের দলবদ্ধভাবে রাত যাপন করতে দেখা যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই আর টুনটুনিদের একসঙ্গে থাকতে দেখা যায় বেশি। একসঙ্গে থাকার সুবিধা হচ্ছে বনবিড়াল বা কোনো শত্রু হামলা চালালে অন্তত একজনও যদি টের পায় তাহলে সে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারে। একাজটি ওরা বিস্ময়করভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গেই করে। দলবদ্ধভাবে থাকার এমন দৃশ্য ঢাকার বাইরেও বিরল নয়।

কিন্তু পাখিদের রাতের নীড় বা নিরাপদ আশ্রয়ও মাঝে মাঝে অনিরাপদ হয়ে উঠতে পারে। যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ওদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। প্রলয়ংকরী ঝড়ের রাতে অসংখ্য পাখির জীবনাবসানও নতুন কিছু নয়। এসময় কোনো কোনো পাখি নিকটবর্তী ঘরবাড়িতেও আশ্রয় নেয়। সিডরের সময় দেশের বিস্তীর্ণ উপকূলজুড়ে অসংখ্য পাখির মৃতদেহ দেখা যায়। আবার ভারি ধরনের শিলাবৃষ্টিতেও পাখিরা প্রাণ হারায়। কাজেই শেষ পর্যন্ত ওদের কোনো ঠিকানাই নিরাপদ নয়।

মৃত্যুর আগে পাখিরা বুঝতে পারে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। সে তখন জনহীন নিভৃত এলাকায় চলে যায়। জীবিতাবস্থায় ওরা যেমন সদা সতর্ক থাকে, শত্রুর নাগালের বাইরে থাকতে চায়; মৃত্যুর পরেও সে তাই চায়। সে চায় না, মৃত্যুর পরেও তার দেহ শত্রু কবলিত হোক। এসময় মাঠের পাখিরা যায় আইল কিংবা খড়ের বনে। ফিঙে, শালিক, কসাইরা যায় ডালপালা আচ্ছাদিত গাছের ভেতর। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে তার দেহটি মাটিতে ফেলতে চায় না। এই স্বেচ্ছায় নির্বাসনে মৃত্যুর প্রস্তুতিতে ওদের সঙ্গে অন্য কোনো সঙ্গীরাও থাকে না। তবে কীটনাশক বা কোনো বিষক্রিয়ায় একটি পাখি যদি নিভৃতে যাবার আগেই আকস্মিক মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার সঙ্গীদের কেউ তাকে তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

২০০১ সালে যশোর সদর উপজেলার বারীনগর হাইস্কুল লাগোয়া একটি বাগানে শিলাপাতে প্রায় ৩ শতাধিক পাখির প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে কয়েকরকম শালিক, বাবুই, চড়ুই, কাক ও অন্যান্য পাখি ছিল। মৃত পাখিগুলো একজায়গায় জড়ো করার পরে দলে দলে মানুষ এসেছিল দেখতে। আবার ১৯৯৯ সালের দিকে যশোর সদর থানার ডাকাতিয়া গ্রামে উচ্চমাত্রার কীটনাশক প্রয়োগে প্রায় হাজার খানেক চড়ুই পাখি মারা যায়। দৃশ্যটি ছিল খুবই হৃদয়বিদারক।

ঘন কুয়াশায় যখন দুহাত দূরের কোনো দৃশ্যও চোখে পড়ে না তখন পাখিরা বেশ অসহায় হয়ে পড়ে। তবুও তারা ঠিক ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ওদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে মস্তিষ্কে স্থাপিত নিজস্ব রাডার। এ কারণে ওরা উড়তে গিয়েও কোনো গাছ বা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খায় না। গবেষকরা বিষয়টি নিয়ে গবেষণাও করেছেন।

পাখিদের বাসা বানিয়ে নির্দিষ্ট কোনো একটি স্থানে বসবাসের সবচেয়ে বড়ো বিপদ মানুষ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন শিকারি পাখি এবং সাপও ওদের বড়ো শত্রু। এর মধ্যে আবার দিন এবং রাতের শিকারি পাখিও আলাদা আলাদা। দিনের বেলায় ঈগল, বাজ, হাড়িচাঁচা, কাক ও চিল ইত্যাদি এবং রাতের বেলা হুতুম পেঁচা, সাপ ও বনবিড়াল পাখিদের বাসায় ডিম ও ছানাপোনার জন্য হামলা চালায়।

আগেই বলেছি, ওরা কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাসের কোনো বাসা বানায় না। বাসা বানানোর আগে সব পাখিই জায়গা নির্বাচনের জন্য এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে বেড়ায় অনেকক্ষণ। তারপর দুজনে মিলে জায়গা পছন্দ করে বাসা বাঁধতে লেগে যায়। আমাদের দেশে সবচেয়ে শিল্পসম্মত ও নয়নজুড়ানো বাসা বানায় বাবুই। খেজুর পাতার চিকন আঁশ ঠোঁটে কেটে ওরা গোলগাল বাসা বানায়। শরৎকালে খেজুর গাছের মাথি বা অপরিণত তালগাছের পাতার আড়ালে বাসা বানায় মুনিয়া। ওরা বাসার চারপাশে সাদা কাশফুল গুঁজে দিতে পছন্দ করে। কুকো পাখিরা শুকনো বাঁশপাতা দিয়ে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর বাসা বানায়। যদিও ওরা বাসা বানাতে অনেক খাটুনি করে কিন্তু বাসা মোটেও আকর্ষণীয় হয় না। তবে বক, কাক, চিল এবং শকুনের বাসা আরো কুৎসিত। এদের বাসা দেখলে মনে হবে যেন অনেকগুলো ডালপালা কোথা থেকে যেন এসে জড়ো হয়েছে। গাংশালিকের বাসা গোলাকার ফুটবলের মতো। শহরের লাইটপোস্টের মাথায়ও মাঝেমধ্যে এদের বাসা দেখা যায়। গাছের কোটরে বা পুরনো দালানের খোঁড়লে বাসা করে পেঁচা। শুধুমাত্র গাছের কোটরে বাসা বানানোর দলে আছে দোয়েল, ময়না, টিয়ে, শালিক, বেনেবউ, কাঠঠোকরা ইত্যাদি। ডাহুক বাসা বানায় ডোবা নালার পাশে ঘন ঝোপঝাড়ে। বাবুইর মতো নিপুণ কারিগরের কুশলতায় বাসা বানায় টুনটুনি আর পাশফুটকি। আশ্চর্য কৌশলে ওরা বড়ো বড়ো পাতা জোড়া দিয়ে বাসা বানায়। এরপর মাকড়শার জাল দিয়ে জড়িয়ে রাখে।

'পরিযায়ী পাখিদের যাতায়াতের পথকে উড়ালপথ বলে।'

শীতের পাখি বলতে আমরা মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষত শীতপ্রধান দেশ থেকে এদেশে আগত পরিযায়ী পাখিদের বুঝি। কিছু দিন আগেও পরিযায়ী পাখিদের অতিথি পাখি বলা হতো। পাখি বিশেষজ্ঞগণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বলেন এরা আসলে অতিথি নয় বরং আমাদের দেশের পরিযায়ী পাখি। পাখি কখনো অতিথি হয় না। পরিযায়ণ বা মাইগ্রেশন (Migration) অর্থ বেঁচে থাকার তাগিদে অন্যত্র যাওয়া, যেখানে ওরা নিজেদের জীবণ বাঁচাতে পারবে। এসব শীতের পাখি আমাদের দেশের স্থায়ী আবাসিক পাখি না হলেও এদেরকে অস্থায়ী আবাসিক পাখি বলা যায়।

আমাদের দেশে শীত ও গ্রীষ্মে পাখিরা পরিযায়ী হয়ে আসে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে ১০% পাখি আসে গ্রীষ্মকালে আর ৯০% পাখি আসে শীতকালে। জীববৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে শীতের পরিযায়ী পাখি আমাদের দেশের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে। পৃথিবীর মোট ১০ হাজার প্রজাতির পাখির মধ্যে ১,৮৫৫ প্রজাতিই পরিযায়ী। আর আমাদের দেশের প্রায় ৭০০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৩০০ প্রজাতিই পরিযায়ী। এসব শীতের পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এদেশের বিভিন্ন হাওর, বাঁওড়, খাল-বিল, নদী ও সমুদ্রের বিভিন্ন উপকূলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচরণ করে।

এই আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে, কোনো ব্যক্তি অভয়ারণ্যে চাষাবাদ করতে পারবে না, কোনো শিল্প কলকারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করতে পারবে না, কোনো উদ্ভিদ আহরণ, ধ্বংস বা সংগ্রহ করতে পারবে না, কোনো প্রকার অগ্নি সংযোগ করতে পারবে না, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করতে পারবে না, কোনো বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করতে বা ভয় দেখাতে পারবে না কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট হয় এরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ বা অন্য কোনো অস্ত্র বা দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবে না। বিদেশি প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রবেশ করাতে পারবে না। কোনো গৃহপালিত পশু প্রবেশ করাতে বা কোনো গৃহপালিত পশু নিরুদ্দিষ্ট রাখতে পারবে না, বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করতে পারবে না, কোনো খণিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান বা গর্ত করতে পারবে না, ইচ্ছে হলেই কোনো উদ্ভিদ বা উহার অংশ কাটতে পারবে না, জল প্রবাহের গতি পরিবর্তন, বন্ধ বা দুষিত করতে পারবে না এবং কোনো অচেনা ও আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ প্রবেশ করাতে পারবে না।

উপরোক্ত বিধিনিষেধ ছাড়াও অভয়ারণ্যে সর্বসাধারণের অননুমোদিত প্রবেশ, অবস্থান, গবেষণা, ছবি তোলা, বিরক্ত করা, আবাসস্থল দূষণ করা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও উপদ্রব করা—এর উপর নিষেধাজ্ঞার বিধান করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এ পাখির অভয়ারণ্য ছাড়াও যে-কোনো স্থানে পাখি শিকার, হত্যা, ক্রয়-বিক্রয়, আটক রাখা, পরিবহণ করা, পাখির মাংস বা দেহের অংশ পরিবহণ বা হেফাজতে রাখা ইত্যাদিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পাখির অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে বা বাইরে দেশের যে-কোনো স্থানে পাখি শিকার, হত্যা, ক্রয়-বিক্রয় বা পরিবহণ সংক্রান্ত বর্ণিত অপরাধসমূহের জন্য সর্বনিম্ন ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড ও দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে পাখির অভয়ারণ্য ঘোষণা

বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশে এখনো তেমন কোনো পাখির অভয়ারণ্য গড়ে না ওঠলেও কিছু কিছু স্থান, যেমন— মৌলভীবাজারের বাইক্কা বিল, জলাভূমি, অভয়ারণ্য, হাইল হাওর ও হাকালুকি হাওর, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, নোয়াখালির দমার চর ইত্যাদি পাখির অভয়ারণ্য হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে দেরিতে হলেও সরকার বাংলাদেশে

পাখির অভয়ারণ্য

মোল্যা রেজাউল করিম

'পাখির অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে বা বাহিরে দেশের যে কোন স্থানে পাখি শিকার, হত্যা, ক্রয়-বিক্রয় বা পরিবহন সংক্রান্ত বর্ণিত অপরাধসমূহের জন্য সর্বনিম্ন ৬ মাসের কারাদন্ড ও ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ড ও দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।'

মতো পাখির কলোনি শনাক্ত করা হয়েছে। পাখি ও প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ এবং এলাকাবাসীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে পাখির নিরাপদ কলোনি।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় আজ সারাবিশ্ব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এখনই সময় এসেছে বিরাজমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে পাখির কলোনিগুলো সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা। এসব পাখি কলোনিকে পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামের উন্নয়নসহ ব্যাপক প্রকৃতি-পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

পাখির এই তিনটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এক. হার্ডিঞ্জব্রিজ পাখি অভয়ারণ্য, ঈশ্বরদী, পাবনা।

দুই.প্রেমতলী পাখি অভয়ারণ্য, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

তিন.কাজীপুর পাখি অভয়ারণ্য, যমুনারচর, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

বাংলাদেশে পাখি কলোনি ও ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন এলাকায় লোকালয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগান, পুকুরপাড়, গাছপালা, পুকুর-জলাভূমি, ফসলের ক্ষেত, আমবাগান, বাঁশঝাড় ইত্যাদি স্থানে নাটোরের গ্রামে গ্রামে গাছে গাছে শিশু-কিশোর-তরুণরা গড়ে তুলছে পাখির নিরাপদ বাসা- কলসবাসা।

একত্রিতভাবে হাজার হাজার পাখির বসবাসের স্থান গড়ে উঠেছে। স্থানীয়ভাবে ঐ সকল স্থানকে পাখির কলোনি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২০টির

চড়ুই পাখি

মো. মুশফিকুর রহমান মিদুল

আমার
ঘরের কোণে
চড়ুই পাখির বাসা,
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ে
করছে আসা যাওয়া।
খরকুটো আর বুনো লতা
আনছে ঠোঁটে করে
দুজন মিলে ঘর বানিয়ে
থাকবে জীবন ভরে।
ঘরের পাশে বসে দু'জন
করছে আলোচনা
ছানা দুটো পুশব মোরা
ঘরটি হলে বোনা।

৫ম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, মুগদা, ঢাকা।

ডাহুক বোনের গল্প

উৎপল কান্তি বড়ুয়া

ঘন বেত ঝাড়ের ভেতর ডাহুক পাখির বাসা। বাসা থেকে সাড়ে তিন চার হাত ঢালু নিচে ঘন সবুজ ফেনার পুকুর। বাবা ডাহুক খাবারের খোঁজে বেরোয়। যাওয়ার সময় তার বাচ্চা ডাহুক মেয়ে দুজনকে সাবধান করে দিয়ে যায়—দেখো, কোনো অবস্থাতেই বাসা থেকে বেরুবে না। বাসা থেকে বেরুলে ঢালু বেয়ে গড়িয়ে ফেনা পুকুরের জলে পড়ে যাবে। উঠতে পারবে না শেষে। বড়ো বেশি চেঁচামেচি করবে না। আওয়াজ শুনে বাজপাখি না আবার ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। বাচ্চা ডাহুক মেয়ে দু'জনকে আদর করে বলে- সাবধানে থেকো মা'রা আমার।

দুজন বাচ্চা ডাহুক মেয়ের মা নেই। সেদিন যে বাবা ডাহুককে সাথে রেখে মা ডাহুক খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল। আজ পর্যন্ত ফিরল না। বাবা ডাহুক অনেক খোঁজাখুঁজি করল। না, মা ডাহুকের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। বাবা ডাহুক বলল- শিকারির পেটে গেছে তোদের মা।

বাচ্চা ডাহুক মেয়ে দু'টোর সাথে সাথেই কী কান্না! কাঁদছে তো কাঁদছেই। অঝোর ধারায় সে কান্না! থামতে চায় না সে কান্না। বাবা ডাহুক বাচ্চা ডাহুক মেয়ে দুটোকে সান্ত্বনা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করে। বাচ্চা ডাহুক মেয়ে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে সে রাতে।

সকাল হয়। ভোরের আলো ফোটে পরদিন। বাবা ডাহুক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাচ্চা মেয়ে ডাহুক দুজনকে, তাদের জন্য খাবারের খোঁজে বেরোয়। বাবা ডাহুক খাবার নিয়ে আসে। বাবা ডাহুকের ঠোঁট থেকে বাচ্চা ডাহুক মেয়েরা খাবার খায় তাদের ছোট্ট কচি ঠোঁট দিয়ে।

সাতদিন গত হতে চলল। মা ডাহুক হারিয়ে গেছে। মা ডাহুকের জন্য বাচ্চা ডাহুক দুবোনের বুকে কী কষ্ট! কী শোক! বাবা ডাহুক সান্ত্বনা দেয়। -কী আর করা মা'রা আমার! আমাদের যে জীবনটা এরকম। কখনো বাজপাখির নজরে পড়ি আমরা। কখনো বা সাপ বা বেজির। আবার কখনো বা শিকারির হাতে শিকার হই। আমাদের কপালটাই এমন!

বাচ্চা ডাহুক দুবোনের শরীরে কিছু কিছু হালকা পালক গজিয়েছে এ ক'দিনে। বাবা ডাহুকের কথার অবাধ্য হয়ে একটু আধটু বাসার বাইরে গিয়ে চটজলদি আবার বাসায় ফিরে আসে দু'জন।

প্রতিদিনের মতো বাবা ডাহুক খাবারের খোঁজে বেরোয়। সকাল গড়িয়ে যায়। দুপুর গড়ায়। বিকেল গড়িয়ে সাঁঝ, তারপর রাত। না, বাবা ডাহুক খাবার নিয়ে বাসায় ফিরল না। বাচ্চা ডাহুক দু'বোন বাবা ডাহুকের জন্যে অপেক্ষা করে আর কান্না করে, দুবোনের সে কী কান্না! তবে কী, আমাদের বাবা ডাহুকও মা ডাহুকের মতো শিকারির পেটে গেল? শিকারির শিকার হলো?

বাচ্চা ডাহুক দু'বোন দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে।

আবার সকাল হলো। নতুন আরেক সকাল। বাচ্চা ডাহুক দু'বোনের প্রচণ্ড খিদে লাগল। গতকাল কিচ্ছু পড়েনি পেটে। না আর খিদে সহ্য হচ্ছে না। গতকাল পুরোটা দিন পার হয়ে গেলো শেষে কিচ্ছু না খেয়ে। তবু বাবা ডাহুক ফিরে আসেনি বাসায়। তাই খাবার খাওয়া হয়নি। মা ডাহুকের মতো বাবা ডাহুক ফিরবে না আর। বাচ্চা ডাহুক দু'জনের মনের ভেতর জানা হয়ে যায়।

বাবা ডাহুক আর মা ডাহুক তো নেই। আমাদের খাবার আমাদেরই সংগ্রহ করতে হবে-বাচ্চা ডাহুক দু'বোন বাবা ডাহুক ও মা ডাহুকের শোক বুকে নিয়ে বাসা থেকে বেরোয়। একসাথে দু'জন সত্যি সত্যি বেরোয় এই প্রথম খাবারের খোঁজে। বাচ্চা ডাহুক দু'বোন বেরোয় ঘন বেত ঝাড়ের নিচে ফেনা পুকুরের ফাঁকে, আড়ালে খাবারের খোঁজে গুটি গুটি পায়-আস্তে, অতি সাবধানে।

গল্প

সাইমন ও তার পাখিটি

ফজলে আহমেদ

সাইমন পাড়া প্রতিবেশী ছেলেদের সঙ্গে, ধুলিওড়া মেঠো পথ ধরে দল বেঁধে স্কুলে যায়। তারা যখন হেঁটে যায়, তখন মনে হয় একটা ছন্দ তুলে যাচ্ছে। এই হাঁটাটা একটা অসাধারণ দৃশ্যের সৃষ্টি করে রাখে। গ্রাম্য সকালের এটাই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলে অনেকেই মনে করে থাকে।

বিকেল বেলা। স্কুল ছুটি হলেই, আবার তারা দলবেঁধে বাড়ি ফিরে আসে। তখন সাইমন ওই দলের সঙ্গে আসে না। কোথাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। স্কুল প্রাঙ্গন যখন একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে তখন বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে একা একা হেঁটে আসতে থাকে।

সাইমন একটু এগিয়ে যাবে, আবার থমকে দাঁড়াবে। একটা রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাবে। আবার হাঁটা ধরবে। বিশেষ করে সবুজ গাছ তাকে বেশি আকর্ষণ করে। গাছের ডালে যখন পাখিরা বসে থাকে তখন একটা আগ্রহ নিয়ে ওদের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। তাতে সে অনেক আনন্দ পায় এবং চোখ দুটোকে স্বার্থক মনে করে।

পাশের ধানখেতে, ধানের শীর্ষে ফড়িং ওড়াউড়ি করে। অনেক সময় হিমেল বাতাস ঢেউ তুলে বয়ে যায়। তখন অন্যরকম একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হয় যা সাইমনের মনে দোল দিয়ে যায়। তখন ও আপন মনে বলে ওঠে, আহা। কি আনন্দ!

একদিন বিকেল। আর ওই বিকেলটাতেই আকাশে অগণিত মেঘের আনাগোনা। যে-কোনো মুহূর্তে ঝুম বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। এই ব্যাপারটা তাকে স্পর্শও করেনি। সাইমন তার মতো করেই হেঁটে যাচ্ছে। খানিকটা পথ যেতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হতে থাকে। আশে পাশে কোনো বাড়ি ঘরও নেই যে দৌড়ে গিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কাছেই একটা গাছ ছিল, আপাতত ওই গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয় সে। সাইমন আন্দাজ করতে পারে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। অবস্থা ভালো বলে মনে হচ্ছে না। যে-কোনো মুহূর্তে ঝুম বৃষ্টি নেমে যাবে তখন দশাটা কি দাড়াবে? আর বৃষ্টিতে ভিজলে মা খুব রাগ করবেন। যা আছে কপালে বলেই সাইমন দেয় এক ভোঁ দৌড়।

দৌড়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই, পাশে দপ করে, কি যেন একটা কিছু ওপর থেকে পড়ার শব্দ হয়। তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সাইমন। দেখে, একটা পাখির বাচ্চা কাতরাচ্ছে। এই মুহূর্তে, কোন পাখির বাচ্চা, তা জানার দরকার নেই। দরকার নেই, কোনো সহানুভূতি জানানোর। খপ করে বাচ্চাটিকে হাতে নিয়ে, আরেকটা দৌড়ে সোজা বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। তখন ভিজে একেবারেই জবজবা হয়ে গেছে।

সাইমনকে এমন ককভোজ অবস্থায় দেখে, মা অবাক করা গলায় বলল, একি সাইমন। তোমাকে এমনভাবে আসতে হবে কেন? স্কুল ঘরে কি জায়গা ছিল না? এখন যদি গায়ে জ্বর আসে।

সাইমন কোনো কথা না বলে, ডান হাতটা মায়ের দিকে তুলে ধরে। যা দেখে মা অবাক বিস্মিত কণ্ঠে বলল, এ দেখি পাখি। ওকে আবার কোত্থেকে ধরে আনলে। ও জীবিত, না মৃত?

আমার মনে হয়, ওটা ঘরে ভূত হয়ে আছে।

সাইমন বাচ্চাটাকে ঘরের মেঝেতে রাখে এবং তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনটা অসম্ভব তাগিদ দিচ্ছে। যে করেই হোক, ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে কিন্তু ও যে নিথর হয়ে পড়ে আছে। সাইমন বাচ্চাটাকে দ্রুত হাতে তুলে নেয়। দেখে, মাথাটা একটু একটু নাড়াচ্ছে। তার মানে মারা যায়নি। দেহটাতে প্রাণ আছে।

সাইমন আর দেরি না করে, বাচ্চাটাকে নিয়ে সোজা চুলার কাছে চলে যায় এবং আগুনের তাপে ধরে রাখে। আস্তে আস্তে ওর শরীরটা গরম হতে থাকে। এক সময় নাড়াচাড়া শুরু করে দেয়। এবং মাথাটা ওপরে তোলে। সাইমন উপলব্ধি করতে পারে, বাচ্চাটির প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ওকে খুব দ্রুত খাওয়ানো উচিত। সে দুই মুঠো চাল, মুখের ভেতরে দিয়ে চিবুতে থাকে। চালগুলো একেবারে নরম হয়ে এলে দুই ঠোঁট ফাক করে ধরে, বাচ্চাটির লম্বা ঠোঁট তখন মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে চোঁ চোঁ করে খেতে থাকে। এই ভাবে দিনে চারবার খাইয়ে বাচ্চাটিকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলে।

বাচ্চাটি এখন ওড়াউড়ি করতে পারে। কখনো ঘরের

চালে, কখনো ঘরের জানালায়, কখনো গাছের ডালে। তবে ডানা মেলে দূরে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায় না। তবে খাবার সময় হলে, ঠিকই সাইমনের কাছে চলে আসে। সাইমন তাকে খাইয়ে অনেক আনন্দ পায়। বাচ্চাটির একটি নিজেস্ব ঘর মানে একটি খাঁচার দরকার তাই মাকে একটি খাঁচা কিনে দিতে জোর তাগিদ দিলে খাঁচার প্রয়োজন নেই বলে সাফ জানিয়ে দিল মা। বলল, বন্দি করে লালন পালনের চেয়ে একটি মুক্ত স্বাধীন পাখিকে লালন- পালন করা অনেক ভালো।

মায়ের এই উপদেশটা সাইমনের খুবই ভালো লাগল। যেহেতু বাচ্চাটি কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায় না। ধারে কাছেই থাকে। সেহেতু তাকে খাচায় বন্দি করে রাখার দরকারটা কি।

কিছু দিনের মধ্যেই, কোনো দূর অজানা থেকে বাচ্চাটির মা চলে আসে। এবং বাচ্চাটিকে রীতিমতো সঙ্গ দিতে থাকে। বেশ কয়েক মাস এভাবেই চলল। হঠাৎ একদিন দুজনেই উধাও হয়ে গেল। গেল যে গেলই, আর কোনো খবর নেই। সাইমনের ধারণা বাচ্চাটিকে ঠিকমতো যত্নআত্তি করতে পারেনি বলে মা রাগ করে ওকে নিয়ে চলে গেছে। তবে বাচ্চাটিকে মন থেকে ভুলতে পারেনি সাইমন।

বাচ্চাটি উধাও হয়ে যাওয়ার পর স্কুল থেকে ফেরার পথে যে অভ্যাসগুলো সাইমনের ছিল তার পুরোটাই পরিবর্তন করে ফেলে। এখন আর ডান- বাঁ কোনোদিকেই তাকায় না। সোজা বাড়িতে চলে আসে।

সে অনেক দিন পরের কথা। ক্লাসে ইংলিশ স্যার বলেছেন, সাইমন পড়াশোনায় বেশ ভালো করে যাচ্ছে। সামনে অনেক ভালো রেজাল্ট করবে। সাইমনের মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। সে ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরছে। সামনে আমগাছটার দিকে হঠাৎ চোখ যায়। দেখে গাছ ভর্তি অসংখ্য পাখি। কিছু সংখ্যক পাখি স্থির হয়ে বসে আছে। অন্যরা একডাল থেকে অন্যডালে ওড়াউড়ি করছে। হঠাৎ করে ওই অসংখ্য পাখির মাঝখান থেকে, একটি পাখি ওড়ে এসে সাইমনের কাঁধে বসে। সাইমন ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতেই পাখির কাঁধ ছেড়ে হাতের তালুতে গিয়ে বসে। এটি কিছুদিনের জন্য লালন করা ওই পাখিটি।

সাইমন ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, হে পাখি, অকৃতজ্ঞ বলে তোমাকে ঘৃণা করেছিলাম আজ সবার মাঝ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আমার কাছে ছুটে এলে। আমাকে যে মনে রেখেছে তাতেই আমি খুশি। তোমার এই কৃতজ্ঞতাবোধ, আমার সারাটি জীবন মনে থাকবে।

গল্প

চাঁদের দেশের চাঁদকুমারী

বেনীমাধব সরকার

রাজনের কাল সমাপনী পরীক্ষা শেষ হবে। চিত্রাঙ্কন পরীক্ষা। মনোযোগ দিয়ে পাঠ্য বইয়ের সবকটা চিত্রই এঁকেছে। আর বাকি নেই। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজে।

চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে ঘরে পড়েছে। এরপর কোন ছবিটা আঁকা যায় ভাবতে ভাবতে ঠাকুরমার গল্পের রাজকন্যার কথাটি মনে পড়ে যায়। আরো মনে পড়ে সেই রাক্ষসের কথা, যে রাক্ষসটা রাজকন্যাকে ঘুমপাড়িয়ে রেখে আহার সন্ধানে চলে যায়। কেমন হবে তার চেহারা ? ঠাকুরমা বলেছেন খু-উ- ব ভয়ংকর।

এমন সময় খট করে জানালায় একটা শব্দ। তাকাতেই একটি ছায়ামূর্তি আড়ালে চলে যায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। উঠে গিয়ে জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয় রাজন। আলো নিভিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। এবার ঘুমানোর পালা। কিন্তু না , ঘুমটাকেও বোধ হয় দৈত্যটা এসে তাড়িয়ে দিয়েছে। দু-চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম কিছুতেই চোখের পাতায় ঠাঁই পাচ্ছে না। কল্পনায় ঐ ঠাকুরমার গল্পের কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যটাই ছায়া ফেলছে বার বার, অবশেষে কখন যে ঘুম এসে পড়েছে সে বুঝতেই পারেনি।

ঘুমের মধ্যেই সে দেখে যাচ্ছে- এবার দৈত্য নয়, সেই রাজকন্যাটি যেন এসে তাকে আস্তে আস্তে বলছে, রাজন! চাঁদের দেশে যাবে? ফুল-পাখি তোমায় ডাকছে। ফুল-পাখির কথায় এবার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় রাজন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাজকন্যার পিছে পিছে হাঁটতে তাকে। বাইরে এসে দেখে উড়িয়াবাজ ঘোড়া তৈরি।

রাজন জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? আমি চাঁদের দেশের চাঁদকুমারী, তোমাকে নিতে এসেছি। সেখানে অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে, পৃথিবীর মতো সেখানে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ কিছুই নেই।

রাজন দেরি না করে উড়িয়াবাজ ঘোড়ায় উঠে বসে। সঙ্গে সঙ্গে শাঁ শাঁ করে ঘোড়া ছুটে চাঁদের দেশে।

মুহূর্তে এমন এক জায়গায় থামল যেখানে সত্যিই সুন্দর , শ্যামল গাছ, লতা-পাতায় ঘেরা একটি জায়গা।

গাছে গাছে কত ফুল সুবাস ছড়াচ্ছে, পাখিরা গান গাচ্ছে। আর লাল-নীল পরিরা খেলা করছে। রাজনকে

দেখে সবাই আদর করে কাছে টেনে নিল। তাদের সাথে খেলায় মেতে উঠল রাজন।

গাছে গাছে রকমারি ফুলগুলো যেন তাকে দেখে হাসছে। গাছগুলো শ্যামল ছায়া দিচ্ছে। পাখিরা চারদিকে ওড়াওড়ি করছে। একটি পাখি এসে রাজনের কাঁধের উপর বসল। আর একটি তিলা ঘুঘু অন্য কাঁধে বসে বলছে, তুমি খুব ভালো রাজন। রাজন পাখিটাকে আদর দিয়ে বলল, তোমরা এত কাছে এসে কথা বলছ, তোমাদের ভয় করে না?

পাখিটা হেসে বলল, ভয় করবে কেন ? তুমি মানুষ। তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। মানুষেরা কখনো অন্য প্রাণীকে কষ্ট দেয় না। তা করলে তাদের মনুষ্যত্ব রইল কোথায়!

কিন্তু রাজন তা সমাধান করতে পারে না। সে দেখেছে তার বন্ধু পাখির বাসা পেলেই গাছে উঠে বাচ্চা গুলো নিয়ে আসে। আর মা পাখিটা কিচিরমিচির করতে থাকে। তাই তার কিসে দুঃখ ! তাই রাজন ঐ পাখির কথায় সায় দিতে পারছে না। ঐ পাখির সামনে নিজেকে অনেক ছোটো মনে হচ্ছে। ওরা পাখি হয়েও কত ভালো আর আমরা মানুষ হয়েও কত খারাপ।

ঘুঘুটি বলল, চলো আমরা আর কোথাও বেড়িয়ে আসি। রাজন একবাক্যে রাজি। চলো তাহলে। কিন্তু সে তো রাস্তা চেনে না, কোথায় যাবে ?

ঘুঘু বলল, আমি তোমার কাঁধে বসে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি সেদিকে হাঁটবে।

ঘুঘু রাস্তা নির্দেশ করে আর রাজন সে দিকে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে একটি পুকুর পাড়ে এসে হাজির হয়। পুকুর পাড় ঘেঁষে বিরাট ফলের বাগান। শত রকমের ফল ঝুলছে গাছে গাছে- আম, জাম, লিচু, স্ট্রবেরি, আতা, পেয়ারা, কমলা আরো নাম না জানা কত ফল।

পাখিটা বলল, খাও রাজন। তোমার যত খুশি খেয়ে নাও। তারপর ঐ শীতল পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে আরাম করবে। পাখিদের আপ্যায়নে রাজন মুগ্ধ। পাখিরা নিজেরা না খেয়ে শুধু তাকে খেতে বলছে কেন ? ফল খেতে খেতে পাখিকে প্রশ্ন করে তোমরা খাচ্ছো না যে, কেবল আমি খাবো কেন ?

টিয়া এবার কথা বলে, আমরা যখন ফল খাই তোমরা তো ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দাও। এখানে ঐ নিয়ম নেই। গাছের ফল সবাই খাবে, কেউ বাধা দেবে না। আর তুমি তো আমাদের মেহমান, তাই তুমি আগে খাবে, আমরা পরে খাব। হাতের নাগালের মধ্যেই কত রকমের ফল। রাজন খায় আর আনন্দে তার মন নাচতে থাকে। আরো অবাক কাণ্ড হাজারো পাখি এসে তার চারদিকে নেচে-গেয়ে আনন্দ করছে।

ইচ্ছামতো আম, জাম, লিচু খেয়ে রাজনের একটু ক্লান্তি এসে পড়ে। রাজন ওই শানবাঁধা ঘাটের উপর শুয়ে পড়তেই রাজ্যের ঘুম এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

একটি ময়না পাখির ডাকে রাজনের ঘুম ভেঙে যায়। রাজন জেগে দেখে সেই পুকুর ঘাট নেই, নেই সেই বাগান আর পাখির দল। সে শুয়ে আছে তার নিজের ঘরে খাটের উপর।

তবে পাখির ডাক কোত্থেকে এল? হ্যাঁ, যে ময়না পাখিটা তার ছোটো বোন খাঁচায় পুষতো সেই পাখিটার ভোরের ডাকে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠেই দেখে ময়না পাখিটা খাঁচায় বন্দি। তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

মনে পড়ে সেই তিলা ঘুঘুর কথা। তোমরা তো মানুষ, তোমাদের আছে মনুষ্যত্ব, আমরা কেন ভয় করব তোমাদের ?

বনের পাখি মনুষ্যত্বের পরিচয় জানে। আর আমরা সেই মনুষ্যত্বের অপমান করছি। তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজন খাঁচার হুড়কো খুলে ময়নাটাকে মুক্ত করে দেয়। ময়না তো মনের আনন্দে ডানা মেলে উড়ে বনে চলে যায়। ছোটো বোন অর্পিতা এসে যখন দেখল তার ময়না খাঁচায় নেই , সে কী চিৎকার । হইচই করে বাড়ি মাথায় তুলে নিল।

রাজন বলল, শোন অর্পি, কেন যে তোর ময়না ছেড়ে দিয়েছি, সেই কথা শোন। তারপর গত রাতের সেই চাঁদকুমারীর দেশের গল্পটা বলে যায় ধীরে ধীরে। গল্পটা শেষ হলে অর্পিতা চোখের জল মুছে ফেলে বলে, এতদিন আমি ময়নাটাকে খাঁচায় আটকে রেখে কী অন্যায়ই না করেছি। দাদা, তুই ভালোই করেছিস। আমার বান্ধবী অহনার খাঁচায় পোষা টিয়াটাও আমি গিয়ে একদিন ছেড়ে দিয়ে আসবো।

অ্যাংরি বার্ডস!

সত্যিই কি রাগি পাখিরা?

রেজা নওফল হায়দার

মোবাইলে বা কম্পিউটারে গেমস খেলতে ভালোবাসে সবাই। আজ তাই অ্যাংরি বার্ডস সম্পর্কিত চারটি গেমস নিয়ে জানাবো মজার খবর।

অ্যাংরি বার্ডস

রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাওয়া অ্যাংরি বার্ডস গেম সিরিজের প্রথম গেম। এই গেম দিয়েই ব্যাপক পরিচিতি পায় রোভিও কোম্পানি। গেমের কাহিনি হচ্ছে বনের পাখি আর শুকর ছানাদের নিয়ে। পাখিদের কষ্টের ডিম চুরি করে নিয়ে যায় শুকর ছানারা। শান্তশিষ্ট পাখিরা খেপে বোম হয়ে যায়। কিন্তু শুকর ছানারা থাকে সুরক্ষিত দুর্গে, নিরীহ পাখিরা যেখানে ঢুকতে পারে না। কিন্তু এত সহজে পাখির দল হার মানে না। নিজেরাই ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ে দুর্গে। এত সাধের দুর্গ রক্ষা করতে পারে না দুষ্ট শুকর ছানারা। দলে দলে ধ্বংস হয় খেপা পাখিদের তাণ্ডবে। গেমের কায়দাকানুন খুব সহজ, পাখিদের দিয়ে শত্রুর দুর্গ ভাঙতে হবে। একেক পাখির একেক কাজ, কেউ কাঠ কেটে ফালাফালা করতে পারে, আবার কেউ বোমা মারে। যত কম পাখিদের দিয়ে বেশি ভাঙচুর করা যাবে, তত বেশি পয়েন্ট। গেমের গ্রাফিক্স আর শব্দ সঞ্চালন এক কথায় অসাধারণ। একবার খেলতে একবার বসলে উঠতে মন চাইবে না।

অ্যাংরি বার্ডস রিও

অ্যাংরি বার্ডস সিরিজের দ্বিতীয় গেম। এই গেমটা বানানো হয়েছে পাখিদের নিয়ে বানানো একটা অ্যানিমেশন মুভি 'রিও' এর কাহিনি অনুসারে, সহযোগিতা করেছে ফক্স এন্টারটেইনমেন্ট আর ব্লুস্কাই। ব্রাজিলের অপূর্ব এক শহর রিও এই গেমের পটভূমি। গেমের নিয়মকানুন সবই আগের মতো। গ্রাফিক্স আর সুরের কারুকাজ উন্নত হয়েছে আগের চেয়ে। আর যুক্ত হয়েছে কিছু নতুন পাখি। সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা গেম।

অ্যাংরি বার্ডস সিজনস

অসাধারণ গ্রাফিক্সের এই গেমটি অ্যাংরি বার্ডস সিরিজের ৩য় গেম। এই গেমের সবকিছু ছাপিয়ে আপনার চোখে পড়বে গ্রাফিক্সের অসাধারণ কারুকাজ। খেপা পাখিদের নিয়ে খেলতে হবে নানান ঋতুতে, সেইসঙ্গে পালটে যাবে আশপাশের পরিবেশ। হরেক রকম রং তোমার চোখকে ধাঁধিয়ে দেবে। অসাধারণ সব রঙের কারুকাজ আর অপূর্ব সুর তোমার মন জয় করে নেবে মুহূর্তেই।

অ্যাংরি বার্ডস স্পেস

খেপা পাখিদের এবারের অভিযান মহাকাশের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। এবারের গেমে খেলতে হবে বুদ্ধি করে। কারণ আগের গেমগুলোতে পৃথিবীতে খেলা হয়েছিল, তাই মধ্যাকর্ষণের টানে পাখিগুলো নিচে নেমে আসতো, ফলে হিসেব করা সহজ ছিল। কিন্তু মহাকাশে কোনো মধ্যাকর্ষণ নেই, আবার তার মাঝে ছড়িয়ে আছে নানা গ্রহ-গ্রহাণু, যাদের আছে নিজস্ব মধ্যাকর্ষণ। ফলে এবার খেলা আরো উত্তেজনার, কারণ খালি মহাকাশে বস্তু যায় সোজা,কিন্তু আবার গ্রহের টানে সেই গতিপথ যায় বেঁকে। ফলে এবার খেলায় বুদ্ধি লাগবে বেশি, কষ্টও বেশি আর তাই মজাও বেশি। অসাধারণ গ্রাফিক্স আর সুরের কারুকাজ তো আছেই।

চড়ুই পাখি

সরদার আবুল হাসান

চড়ুই পাখি চড়ুই পাখি
কিচিরমিচির ডাকাডাকি
নরম হাওয়ায়
পাখনা মেলে
যাচ্ছো কোথা তুমি?

যাচ্ছি আমি নদীর ধারে
গাছ-গাছালি সারে সারে
হাতছানিতে
ডাকছে আমায়
সবুজ বনভূমি।

নাচব এবং করব খেলা
কাটিয়ে দেবো সারাবেলা
ফুড়ুৎ করে
উড়াল দিয়ে
বাজাবো ঝুমঝুমি।

বাবুই পাখি

ইশরা হোসেন

তাল-খেজুরের গাছের ডালে
বাবুই বাঁধে বাসা।
বাসা তো নয় নৈপুণ্যের
শিল্প সে এক খাসা।
যদিও সে এক ছোটো পাখি
গর্ব আছে তার
নিজের হাতে নিজের বসত
গড়ে চমৎকার

১০ শ্রেণি, মাইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল শাখা, ঢাকা

শীতের পাখি

মনিরুল ইসলাম

আসছে উড়ে শীতের পাখি
স্বপ্ন নিয়ে মেলে আঁখি
নীলাকাশে ডানা মেলে
হাওয়ার তালে শরীর দুলে
থাকবে তারা শাপলা ঝিলে
পুকুর নদী খালে বিলে
যাবে উড়ে পিছু নিলে
এসো ওদের বাঁচাই মিলে

সপ্তম শ্রেণি , মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

কাজী নাফিসা তাবাসসুম, ১০ম শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল

পুরোনো ঢাকার স্কেচ এঁকেছেন বি.এম. তাহমুল কবীর

ঢাকায় নবান্ন আর পৌষমেলা

রফিকুল ইসলাম রফিক

ঢাকা ইতিহাস ঐতিহ্যের নগরী। বিশ্বে ঢাকা মসজিদ নগরী হিসেবে পরিচিত। একসময় ঢাকাকে বাগানের শহর বলা হতো। সে বাগানের শহর এখন পরিণত হয়েছে রিকশার শহরে। বিদেশিদের কাছে এই ইমেজটাই অনেক পরিচিত।

ঢাকাকে বর্তমানে উৎসবের নগরী বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। অনেক উৎসব হয় বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। অতীতে বিভিন্ন উৎসব ও মেলায় হঠাৎ দু'একদিনের জন্য ঢাকা শহরের চেহারা বদলে যেত। বর্ণিল নিশানের বাহারি রূপে ঝলমল হয়ে উঠত ঢাকা। তালপাতার বাঁশি আর নাগরদোলার শব্দে মুখরিত হয়ে উঠত উৎসব ও মেলাঙ্গন। ঢাকায় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে হরেক রকম উৎসব ও মেলা। বর্তমানে ঢাকায় আনন্দময় একটি উৎসব হচ্ছে নবান্ন।

নবান্ন একটি শস্যভিত্তিক লোক উৎসব। এটি আরম্ভ হয় শীতের শুরুতে। হেমন্তে গৃহস্থরা আমন ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ কিংবা পৌষ মাসে এ উৎসব উদযাপন করে।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি আদিবাসী তাদের প্রধান ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে নবান্ন উৎসবের আয়োজন

করে। গারো সম্প্রদায় নবান্ন উপলক্ষে নৃত্যগীত বহুল 'ওয়ানগালা' উৎসবে মেতে উঠে। এ সময় মাঠ থেকে পাকা ধান মাড়াইয়ের জন্য ঘরে তোলে। সেসময় ঘরে ঘরে নতুন চালের পিঠা তৈরি হয় খেজুরের রস ও দুধে ভিজিয়ে। প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও বিলানো হতো। মাঠে-ঘাটে বন্যার পানি কমতে শুরু করলে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে জেলেদের জালে।

সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও বিপুল আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। বাঙালির এই চিরায়ত লোকজ উৎসবকে শহরবাসীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। মঞ্চ তৈরি করে এতে চলে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনভর চলে নৃত্যগীত ও কবিতা পাঠ। মুখরিত হয়ে ওঠে চারুকলার প্রাঙ্গণ। কোনো কোনো সময় আয়োজনকারীদের দর্শকদের মাঝে মুড়ির মোয়া বিলাতে দেখা গেছে। সন্ধ্যার পর উৎসবটি বেশ জমে ওঠে।

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় আয় আয়' ...

পৌষের আনন্দময় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য এ গানটি। বাঙালির ঘরে ঘরে আবহমানকাল ধরেই পৌষ উৎসবের বার্তা নিয়ে হাজির হয়। গত কয়েক বছর থেকে রমনা বটমূলে পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্টলে ধোঁয়া ওঠা ভাপা, পুলি, পাটিসাপটা আর চিতই পিঠার সঙ্গে অন্যান্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো থাকে।

নগরবাসীর কাছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা ও উৎসবের পরিচয় ঘটানোর জন্যই এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় শুধু পিঠা প্রদর্শনী নয়- চলে কবিগান, বাউলগান, নৃত্য আর মঞ্চস্থ হয় নাটক। কুটিরশিল্পের পসরা মেলার আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দেয়। মেলায় দেখা যায় নাগরদোলা। ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে পৌষমেলার হয় জমজমাট আয়োজন।

রমনার বটমূলকে চমৎকার লোকজ নকশায় সাজানো হয়। শ্রোতাদের জন্য সামিয়ানা টানিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়। সারি সারি স্টল রয়েছে উভয় পাশে। খাবারের স্টলে থাকে পিঠা, পায়েস, মিষ্টি, খেজুরের রস, আরও রকমারি খাবারের সমারোহ।

নভেম্বর ৩ তারিখ জেল হত্যা দিবস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। শোকাবহ একটি দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ইতিহাসের বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছিল। যে কারাগারে পৃথিবীর সব মানুষ নিরাপত্তা পায়, সেই কারাগারেই ঘাতক দল ভিতরে ঢুকে বাংলাদেশের জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেই থেকে ৩ নভেম্বর দিনটি 'জেল হত্যা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। জেল হত্যা দিবসে নবারুণ-এর পক্ষ থেকে জাতীয় চার নেতাকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

জেলহত্যা

জাকির হাসান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া চার নেতার সাথে
নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা, ঢাকা কারাগারে মধ্যরাতে,
নভেম্বরের ৩ তারিখ ঘটেছিল কলঙ্কজনক ইতিহাসে
জেলহত্যা দিবস নামে বাঙালি জাতির মনে ভাসে।
নৃশংস সেই হত্যাকাণ্ড ব্রাশফায়ার আর বেয়নেট দিয়ে
চার নেতাকে করল হত্যা ঘাতকরা জেলখানায় গিয়ে,
সপরিবারে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে
বর্বর এই হায়েনাগুলো দেশের ক্ষমতা দখল করে।
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এই খুনিরা আর যে কত
তথ্য প্রমাণ দলিল ছিল এই বিষয়ে শত শত,
হয়েছে বটে বঙ্গবন্ধুকে হত্যাসহ জেলহত্যা মামলার রায়
সব খুনিদের শাস্তি পেতে বাংলার মানুষ দেখতে চায়।

ঐ দেখা যায় পদ্মা সেতু!

শাহানা আফরোজ

নীলাকাশে মেঘের ভেলা। দু'পাড়ে কাশ ফুলের মেলা, নদীর বুকে পাল তুলে চলছে নৌকা, স্টিমারসহ অনেক যান। উত্তাল খরস্রোতা পদ্মা তার নিজস্ব চিরচেনা রূপ নিয়ে চলছে অবিরাম। আর এই পদ্মা নদীর ওপরই দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে সেতু নির্মাণের কাজ। নদীর দুই পাড় আর বাংলাদেশের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের এই সেতু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের পদ্মা সেতুর কান্ডারি। একমাত্র তাঁর সৎ সাহস আর মনোবলের কারণে পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। কোনো ঋণ বা সাহায্য নয়, নিজের দেশের অর্থে তৈরি হচ্ছে এ সেতু। ২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এরপর নানা চড়াই-উতরাই পার করতে হয়েছে সরকারের। সব প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে শক্তিশালী হাইড্রোলিক হ্যামারে নদীর তলদেশ গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত হতে থাকে পদ্মাসেতুর মূল পাইল। এরপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এবার স্প্যান বসানোর মাধ্যমে সব আশঙ্কাই যেন দূর হয়ে গেল। জাজিরা প্রকল্পের জন্য তৈরি করা ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যান বসেছে। এরকম ৪০টি স্প্যান বসলেই সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারবে। এর মাধ্যমেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিল বাংলাদেশ নিজেই পদ্মার সেতু গড়তে পারে।

বন্ধুরা এবার এসো জেনে নেই পদ্মা সেতুর পুরো আদ্যোপান্ত। মাওয়া থেকে জাজিরা পর্যন্ত মূল পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য হতে ছয় দশমিক ১৫ কিলোমিটার। দুইতলা পদ্মা সেতুর কাঠামো তৈরি হবে স্টিল এবং কংক্রিট দিয়ে। ওপর তলায় থাকবে চার লেনের মহাসড়ক, নিচ দিয়ে যাবে রেললাইন। এ সেতু হলে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমের ২১ জেলার সরাসরি যোগাযোগ হবে সড়ক ও রেলপথ। ৪২টি পিলারের ওপর তৈরি হবে পদ্মা সেতু। প্রতিটি পিলারে বসানো হবে ছয়টি পাইল। মাওয়া প্রান্তে ভায়াডাক্টে আরো ১২টি এবং জাজিরায় বসবে ১৬টি ট্রানজেকশন পিলার। বাংলাদেশ সেতু বিভাগের তথ্যানুসারে পদ্মা সেতু তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। এর নির্মাণ কাজ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৪৯ শতাংশ। ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত ছয়টি পিলার বসানোর কাজ শেষ পর্যায়ে। শেষ হতে চলেছে ৩৯ ও ৪০ নম্বর পিলারের কাজও। ৪০টি পিলার নির্মাণ করা হবে নদীতে, দুটি হবে নদী পারে। নদীতে তৈরি করা প্রতিটি পিলারে ছয়টি করে পাইলিং করা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় ১২৭ মিটার পর্যন্ত।

একটি পিলার থেকে আরেকটি পিলারের দূরত্ব ১৫০ মিটার। নদীতে মূল সেতুর ২৬২টি পাইলের মধ্যে ৭৫টি বসেছে। এছাড়া জাজিরায় সেতুর ভায়াডাক্টের ১৮৬টি পাইল বসেছে। ১৭২টির মধ্যে সাতটি পাইল বসেছে। আর এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে পদ্মা সেতু। আরো একটি সুসংবাদ হলো এই সেতুটি এশিয়ান হাইওয়ের পথ হিসেবেও ব্যবহৃত হবে। পদ্মা সেতু এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সাইবার অপরাধ

এসো সচেতন হই

মেজবাউল হক

বন্ধুরা, আমাদের সবার বাসায় রয়েছে মুঠোফোন, ট্যাব, কম্পিউটার। ব্যবহার করছি ইন্টারনেট। যা আমাদের জীবনকে করেছে গতিময়। এক ক্লিকে পেয়ে যাচ্ছি নানা তথ্য-উপাত্ত। দিন দিন আমাদের সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ ও ইউটিউব। এগুলোর মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন রেসিপি, ভ্রমণ, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য,

খাদ্য ও পুষ্টি, ওষুধ, জার্নাল, আই নিউজ, টিভি, রেডিও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রকৌশল বিদ্যা, বই, শপিং, খেলাধুলা, রাজনীতি, ধর্ম, আইন, সংস্কৃতি এবং পরিবহণ ব্যবস্থার খবর ও নানা তথ্য।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমরা গুলিয়ে ফেলছি। এ কারণেই অসীম সম্ভাবনার তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের কাছে দুঃখ ও আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছে। বাড়ছে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ। সাইবার অপরাধ হলো এমন এক ধরনের অপরাধ, যেখানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অবৈধ কাজ করা, ওয়েবসাইট হ্যাকিং, কারও গোপন তথ্য ও বার্তায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ, ভাইরাস প্রচলন বা উপস্থাপনা, কারও মানহানিকর ছবি বা কথা ইলেকট্রনিক আকারে প্রকাশ, ইলেকট্রনিক প্রতারণা বা ব্ল্যাকমেইল, কারও গোপনীয় অধিকার লঙ্ঘন, কপিরাইট লঙ্ঘন, ই-মেইলের মাধ্যমে কারও মানহানিকর অপবাদ ছড়ানো এবং মৃত্যুর হুমকি দেওয়া প্রভৃতি। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের মতে, সাইবার অপরাধের ফলে প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ১৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ জনসমক্ষে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এ ধরনের ঘটনায় অনেক পরিবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বন্ধুরা, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে স্টপ, থিংক, কানেক্ট–এ বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ ইন্টারনেটে কোনো আকর্ষণীয় পোস্ট দেখলেও তাতে ক্লিক করার আগে থামতে হবে, তারপর ভাবতে হবে বিষয়টি আসলে কী এবং এরপর নিরাপদ মনে হলে সেটিতে ক্লিক করে যুক্ত হবে। নিজেরা সচেতন থাকব এবং অন্যদের সচেতন করব।

এছাড়া সম্প্রতি ব্লু হোয়েল গেম আমাদের তরুণ সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। এটি একটি মৃত্যুফাঁদ। তাই সবাইকে এ গেম থেকে দূরে থাকতে হবে। অন্যদেরকে সচেতন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বাড়িতে থাকা ছোটো ভাই-বোন কিংবা স্কুলের সহপাঠীরা যাতে এতে জড়িয়ে না পড়ে। তোমরা জেনে খুশি হবে, সরকার সাইবার নিরাপত্তায় চালু করেছে হেল্পলাইন।

যার নম্বর **০১৭৬৬ ৬৭৮৮৮৮**। সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা এই নম্বরে ফোন করে জানাতে পারো সাইবার সংশ্লিষ্ট হয়রানির অভিযোগ। বন্ধুরা, এখুনি তোমার বাবা-মায়ের বা আত্মীয় স্বজনের মোবাইলে এই হেল্পলাইন নম্বরটি সংরক্ষণ করতে পারো। চাইলে লিখে রাখতে পারো তোমার ডায়েরিতেও। এছাড়া এই মোবাইল হেল্প নম্বরের মাধ্যমে যে-কেউ সাইবার অপরাধ বিষয়ে জানতে এবং বুঝতে সহায়তা পাবেন।

ছোট্ট বন্ধুরা, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির আশীর্বাদ থেকে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। আমাদের প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করতেই হবে। তবে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে কাজে লাগাতে হবে। তাহলে-ই তো আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের পূর্ণ সুবিধা লাভ করতে পারব।

বাংলাদেশি চিকিৎসকের অভাবনীয় সাফল্য

নবারুণের বন্ধুরা, এবার তোমাদেরকে একটা খুশির খবর জানাবো। খবরটি হলো–বাংলাদেশের একজন ডাক্তার চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশাল অবদান রেখেছেন। তার নাম ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের চিশতি।

যা কেউ কখনো ভাবেনি। তাই-ই তিনি করে দেখিয়েছেন। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। খালি শ্যাম্পুর বোতল কাজে লাগিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন–কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র। যা নিউমোনিয়া চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা যাবে। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৯ লাখ ২০ হাজার শিশু নিউমোনিয়ায় ভুগে মারা যায়। এর বেশিরভাগ শিশুই দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকা অঞ্চলের।

১৯৯৬ সালে ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের চিশতি বাংলাদেশ সিলেট মেডিকেল কলেজের শিশুশিক্ষা বিভাগে কাজ করতেন। হাসপাতালে শিশুদের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মরতে দেখে এক সন্ধ্যায় তিনি নিজের কাছেই নিজে প্রতিজ্ঞা করলেন, প্রতিজ্ঞার পেছনে কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ডাক্তার হিসেবে ইন্টার্ন করার প্রথম রাতেই আমার চোখের সামনে তিনটি শিশু মারা যায়। কিছুই করার ছিল না। আমি এত অসহায়বোধ করছিলাম যে, আমি কেঁদে দিয়েছিলাম'।

সে রাতের পর বিশ বছর কেটে গেছে। এতদিন ধরে গবেষণার পর ডা. চিশতি এমন একটা জিনিস তৈরি করেছেন যা খুবই কম খরচে হাজার হাজার শিশুর জীবন বাঁচাতে সক্ষম। যন্ত্রের মূল অংশটি হলো শ্যাম্পুর খালি বোতল।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে যায় বা ফুলে যায়। ফলে শিশুদের অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা অনেক কমে যায়।

উন্নত দেশের হাসপাতালগুলোতে এরকম পরিস্থিতিতে নিউমোনিয়াম আক্রান্ত শিশুদের শ্বাস নিতে সাহায্য করার জন্য এক ধরনের ভেন্টিলেটর বা কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ যন্ত্রটি খুবই ব্যয়বহুল। প্রতিটি যন্ত্রের মূল্য প্রায় ১৫,০০০ ইউএস ডলার অথবা ১১,০০০ পাউন্ড। এছাড়া মেশিনগুলো বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দিয়ে পরিচালনা করতে হয়। এই ধরনের যন্ত্র বেশি করে কেনা বাংলাদেশ, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যও কঠিন।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা নিউমোনিয়ার চিকিৎসার কম খরচের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও পৃথিবীতে প্রতি সাত জনে একজন শিশু মারা যাচ্ছে।

ডা. চিশতির বিশ্বাস উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যেকটি হাসপাতালে তার উদ্ভাবিত কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ব্যবহার করবে। আর সেই দিনই আমরা সবাই বলতে পারবো নিউমোনিয়ায় আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার শূন্যের কাছাকাছি।

বন্ধুরা, তোমরাও বড়ো হয়ে একদিন ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের চিশতির মতো দেশের কল্যাণে কাজ করবে এটাই প্রত্যাশা করছি।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে অঙ্গ সংযোজন

তৃতীয়বারের মতো ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত পঙ্গু হাসপাতালে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন। ভারতের জয়পুর ফুটওয়্যারের সহযোগিতায় ১৫ গত বছর ১ হাজার ৪০০ প্রতিবন্ধীকে চিকিৎসার মাধ্যমে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করা হয়। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে-কেনো প্রতিবন্ধী এখানে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করতে পারছে। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণকারীদের সহযোগিতার এগিয়ে এসেছিল ভারতীয় এই সংস্থাটি।

'আন্ডার প্রিভিলেজও চিলড্রেনস' এডুকেশনাল প্রোগ্রামস (ইউসেপ) বাংলাদেশ এবং অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের যৌথ সহযোগিতায় প্রতিবছর এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ইউসেপ বিকলাঙ্গদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং অ্যাপেক্স তাদের কৃত্রিম পা বিনামূল্যে প্রদান করে।

জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে আলোহীন বেলী

তিন বছর বয়েসই টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দু'চোখের আলো হারায় বগুড়ার শাহজাহানপুরের বেলী খাতুন। দৃষ্টিহীন হয়ে তিনি পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে থাকেননি। অদম্য ইচ্ছার জোরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি এখন দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

লেখাপড়া শেষে সেনিস্ট্রিবল উইথ ডিজেবেলিটি ইন বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণ শেষে বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানের নিজে কাজ করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশনে (সিএসএফ) চাকরি করছেন। এ প্রতিষ্ঠান সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের খুঁজে বের করে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে থাকে।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

‘ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস পিস প্রাইজ’ পাচ্ছে সাজেদা আক্তার

দারিদ্র্য, ইভটিজিং, ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নেওয়া, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ১০৭ বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দেওয়া কিশোরী সাজেদা আক্তারকে এ বছর ‘ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস পিস প্রাইজ’-এর জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কার শিশুদের নোবেল পুরস্কার হিসেবে খ্যাত। শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য যে-সব শিশু সাহসের সঙ্গে লড়াই করে, প্রতিবছর তাদের এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

গ্রামের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামী কর্মী দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সাজেদা বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। ২০০৯ সালে বিদেশি সাহায্য সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল-এর একটি শিশু সংগঠনে সদস্য হিসেবে যোগ দেয় সাজেদা। ২০১৩ সালে এলাকায় গঠিত কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্য হয় সে। এই সংগঠনের হয়েই তখন থেকেই গ্রামে গ্রামে বাল্যবিবাহ বন্ধ, ইভটিজিং, নেশার বিরুদ্ধে সচেতনামূলক পথনাটক, গান, সভা করতে থাকে। পড়ালেখার পাশাপাশি এই ক্লাবের হয়েই চলতে থাকে তাঁর স্বেচ্ছাশ্রমের কাজ। যেখানে বাল্যবিবাহ, সেখানেই এই কিশোরী প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে নারীদের উত্যক্তকারী বখাটে প্রতিরোধে। এলাকার কিশোরীদের ওপর পারিবারিক ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াচ্ছে কিশোরী সাজেদা।

এখন এই সাহসী মেয়েটির সঙ্গে আছে আরো ১০০ কিশোর-কিশোরী। যাদের এই প্রচেষ্টাকে এলাকার লোকজন প্রথমদিকে ভালোভাবে না নিলেও এখন সবাই তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছে এবং সাহায্যে এগিয়ে আসছে। নিজ উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমে এগিয়ে আসা এই কিশোরী হোক নারীর অগ্রযাত্রার প্রেরণা। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ‘ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস পিস প্রাইজ’ পেয়েছিল পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই।

প্রশাসনের উদ্যোগে ৭ বাল্যবিবাহ বন্ধ

প্রশাসনের উদ্যোগে একদিনে বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ৭ কিশোরী। সিরাজগঞ্জের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী, মানিকগঞ্জের ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রী, টাঙ্গাইলের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী, ময়মনসিংহের নবম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণির দুই ছাত্রীর এবং সুনামগঞ্জের অষ্টম এক ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ হয় স্ব স্ব উপজেলার ইউএনও-এর তৎপরতায়।

বাল্যবিবাহ নিরোধ দিবস

কন্যাশিশুদের বোঝা মনে না করে কন্যাশিশুদের পেছনে যে খরচ হচ্ছে, তাদের সর্বোত্তম বিনিয়োগ হিসেবে দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। ১২ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে

বাল্যবিবাহ নিরোধ দিবস উপলক্ষে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত মানববন্ধনে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সময় পালটাচ্ছে। কন্যাশিশুরা এখন আর বোঝা নয়, বরং কন্যাদের দেখতে হবে সর্বোত্তম বিনিয়োগ হিসেবে। কন্যাশিশুরাই বড়ো হয়ে মা হবে, নতুন প্রজন্মের জন্ম দেবে। আর ছেলে সন্তানের চেয়ে মেয়েসন্তানই মা-বাবার বেশি যত্ন নেয়।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০১৮

ছোট্ট বন্ধুরা, চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এমন বন্ধুদের জন্য আছে আগাম খবর। তোমরা জানো প্রতি বছর'ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ফিল্ম ফেস্টিভাল বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশে আয়োজিত বৃহত্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোর মধ্যে একটি। যেখানে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিশুদের দ্বারা নির্মিত এবং শিশুদের জন্য নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, শিক্ষামূলক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র।

আগামী বছর আয়োজিত হতে যাচ্ছে ১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০১৮। এবারের স্লোগান 'হয়ে যাও কাঁচা হাতের পাকা ডিরেক্টর'। উৎসবটি ২৭ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি মোট সাতদিনব্যাপী চলবে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য ঢাকা কেন্দ্রিক মূল ভেন্যু থাকবে পাবলিক লাইব্রেরি অডিটোরিয়াম,শাহবাগ। তবে এজন্য বিশাল আয়োজনেরও প্রয়োজন। আর তাই কর্তৃপক্ষ এ উৎসবের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন: শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগ, তরুণ বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগ, সামাজিক চলচ্চিত্র বিভাগ, আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগ ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিভাগ।

চলচ্চিত্র জমাদানের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত। সব বয়েসি শিশু-কিশোর-তরুণরা চলচ্চিত্র জমা দিতে পারবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য থাকবে পুরস্কার,সনদপত্রসহ আর্থিক সম্মানী। চলচ্চিত্র জমা দিতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। আর এজন্য রয়েছে ৩টি ধাপ।

www.cfsbangladesh.org/festival ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে। এরপর প্রথমে অনলাইনে নির্দিষ্ট ফরমে চলচ্চিত্রের নাম নিবন্ধন করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে নিবন্ধিত চলচ্চিত্র ডিভিডিতে ফাইল নাম দিয়ে রাইট করতে হবে পাঠানোর জন্য। এবং তৃতীয় ধাপে নিবন্ধন কোডসহ ডিভিডি ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র প্যাকেটে পাঠাতে হবে নিচের ঠিকানায় :

Children's Film Society Bangladesh
Apt. 3D House, 45 Road, 4/A
Dhanmondi R/A, Dhaka-1205

যে-কোনো ধরনের তথ্যের জন্য www.cfsbangladesh.org ওয়েবসাইট অথবা ফেসবুকে https://facebook.com/cfsbangladesh পেজে যাও এবং উৎসবের সব আপডেট তথ্য জেনে নাও।

জেলায় জেলায় শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আরো একটা আনন্দ সংবাদ রয়েছে। শিশুদের বিনোদন ভুবনে রং ছড়াতে চমৎকার এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। 'সবার জন্য চলচ্চিত্র,সবার জন্য শিল্প-সংস্কৃতি' প্রতিপাদ্যে একযোগে দেশের ৬৪ জেলায় অনুষ্ঠিত হবে 'বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব'। শিশুদের দেখানো হবে বৈচিত্র্যময় বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র। আর তাই চলছে সেই উদ্যোগকে সফল করে তোলার সর্বাত্মক প্রস্তুতি। জমা নেয়া হচ্ছে উৎসবে প্রদর্শনের জন্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র। আগামী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে সপ্তাহব্যাপী এ উৎসব।

শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সকল নির্মাতাকে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী করতেই শিল্পকলা একাডেমির আয়োজন 'বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব- ২০১৭'। উৎসবের জন্য ইতোমধ্যে ৩০টির বেশি চলচ্চিত্রও জমা পড়েছে। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা আরো বাড়তে থাকবে। প্রতি জেলার শিল্পকলা একাডেমি ভবনে প্রদর্শিত হবে উৎসবের চলচ্চিত্র। আর যে-সব জেলায় একাডেমির ভবন নেই সেখানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি মিলনায়তনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। সপ্তাহব্যাপী সকল দৈর্ঘ্যের কাহিনি ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নিয়ে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। জমাকৃত চলচ্চিত্র সিলেকশন কমিটিতে থাকছেন মুনিরা মোরশেদ মুন্নী, সাজুদেল আওয়ালসহ সাত সদস্যের জুরি। উৎসব যেহেতু শিশুদের নিয়ে তাই কমিটিতে শিশুদের প্রতিনিধি হিসেবে রাখা হয়েছে ফারেহা জেবিন ঐশীকে। বন্ধুরা তোমরা সবাই আমন্ত্রিত এই বিশাল আনন্দ- আয়োজনে।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ৩

ডিজিটাল বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার উপহার ডিজিটাল সরকার

বন্ধুরা, তোমরা কি জানো ডিজিটাল বাংলাদেশ কি? বুঝতে পারছো না তো। তবে জেনে নাও। ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই সুখী-সমৃদ্ধ, দারিদ্র্য, ক্ষুধামুক্ত, বৈষম্যহীন জনগণের দেশ- যার মূল চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি মানে ওয়েবসাইটভিত্তিক সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা। সেবা যখন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছে যাবে তখনই বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সামনে এই স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। আর তৈরি করেন রূপকল্প-২০২১। স্বচ্ছতার সাথে স্বল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় তথ্য ও সেবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

তোমরা জেনে খুশি হবে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সরকার প্রায় ১১৬ ধরনের সেবা প্রদান করছে। ই-কমার্স কার্যক্রম, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ই-তথ্য কোষ চালু করেছে। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মাল্টিমিডিয়া দেয়া হয়েছে। ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ই-বুক প্ল্যাটফরমসহ পরীক্ষার ফলাফল ও ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে ওয়েবসাইটে। নাগরিক সেবা এখন শুধু তোমার হাতের ছোঁয়ার অপেক্ষায়। ভূমি জরিপ, স্বাস্থ্য, যে-কোনো নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যানবাহনের টিকিট, ব্যাংকিং সেবা, কৃষি পরামর্শ, মামলা নিষ্পত্তি, ট্যাক্স দেয়াসহ সকল সুবিধা পাচ্ছি আমরা ওয়েবসাইটে। ই-সেবার সাথে আরো পরিচিত করার জন্য হচ্ছে ডিজিটাল উদ্‌বোধনী মেলা। একটুকুই শেষ নয়। এখন জেনে নাও ভবিষ্যৎ ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে হবে ডিজিটাল সেন্টার, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আরো কম্পিউটার ল্যাব, ১০০% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ব্রডব্যান্ড আরো উন্নীতকরণ, সকল সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় ১০০% ই-জিপি বাস্তবায়নসহ আরো অনেক পরিকল্পনা। আর এই স্বপ্নই এগিয়ে নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে। এগিয়ে নেবে তোমরা। ইতিমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য শেখ হাসিনা ২০১৫ আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার অর্জন করেছে।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

Regd, Dha, 143-Monthly Nabarun, Vol-42, No- 5, November 2017, Tk-20.00

তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ

এসে গেছে পিঠা-পায়েস খাওয়ার উৎসব নবান্ন। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে এখন নবান্নের বার্তা। গ্রামের চারদিকে ধানের ঘ্রাণে মৌ মৌ করছে। 'নবান্ন' শব্দটির অর্থ হলো 'নতুন অন্ন'। এসময় নতুন আমন ধানের চাল দিয়ে তৈরি করা হয় পিঠা, পায়েস, ক্ষীরসহ হরেক রকম মজার খাবার। আর এ নবান্ন উৎসবের মিষ্টি মাসটিই হলো অগ্রহায়ণ। বাংলা সনের অষ্টম মাস। এবার তোমাদের জানাই একটি খুশির খবর। বাংলাদেশের অষ্টম সাফল্য নিয়ে। তোমরা কী জানো বন্ধুরা, জুতা বা পাদুকা উৎপাদন করে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। শিশুকাল হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা চলার জন্য জুতা ব্যবহার করে থাকি। নানা রঙের, নানা ঢঙে নিত্যদিনের চলার সঙ্গী হলো জুতা।

তোমরা কি জানো, গত এক বছরে ৩৫ কোটি জুতা উৎপাদন করেছি আমরা। ওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার ইয়ার বুক ২০১৬-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া যায়। উৎপাদনের এ ধারা চলতে থাকলে আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশ হবে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে বিশ্ব অর্থনীতির বাজারে অন্যতম প্রতিযোগী দেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চামড়া ও জুতাসহ চামড়াজাত পণ্যকে ২০১৭ সালের 'বর্ষপণ্য' ঘোষণা করেছেন। আর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১১৬ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার আয় করেছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা